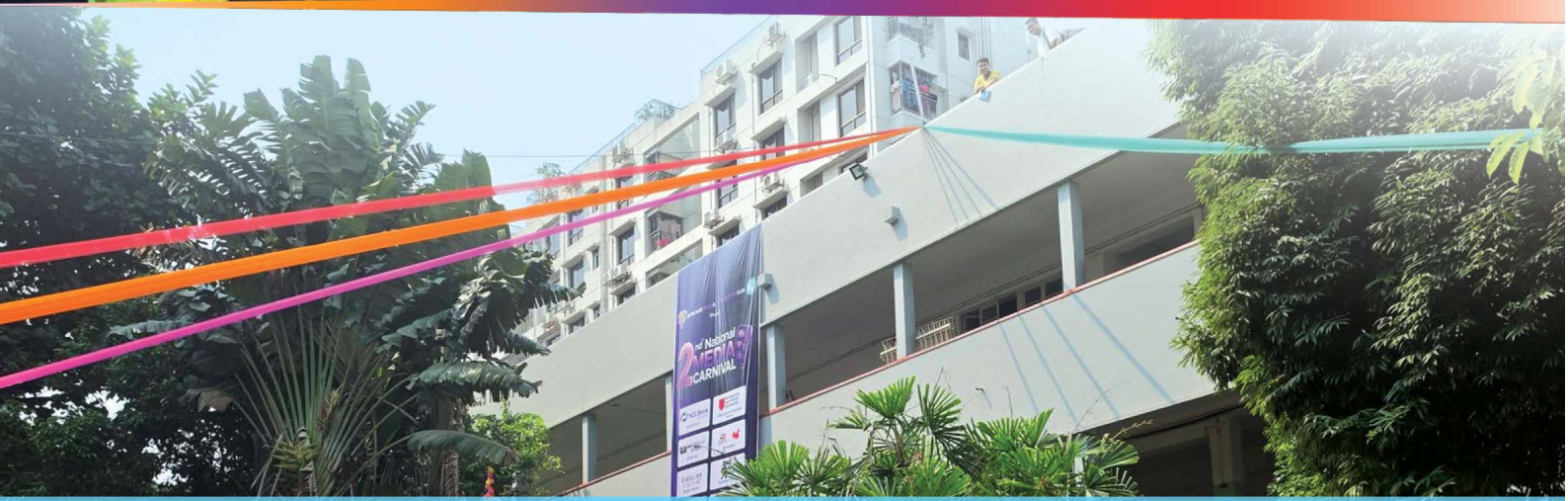
প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৬ ১১ -১৭ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ



ঐতিহ্যবাহী ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীর শতবর্ষ পূর্তি পালন

একশ' বছরের প্রদীপ: বান্দুরার ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীর শতবর্ষ
শুধু যাজক নয়, গড়েছে নেতৃত্বও





হ্যারিংটন ভবন: আমাদের স্মৃতিতে এক জীবন্ত উত্তরাধিকার

২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী



প্রয়াত জন গমেজ
জন্ম : ১৪ নভেম্বর, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার
মৃত্যু : ১০ অক্টোবর, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার

"মরণসাগর পারে তোমরা অমর,
তোমাদের স্মরি।"

তুমি একদিন সকলকে আনন্দিত করে এসেছিলে এই ধরণীতে। আবার একদিন আমাদের সকলকে রাতের অন্ধকারে শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলে। কখন যে ২৯টি বছর পার হয়ে গেল আমাদের মনেই হয় না। তুমি চলে গেছো ঠিকই কিন্তু তোমার চিন্তা-চেতনা, তোমার মতাদর্শ, তোমার কীর্তি ও তোমার পথপ্রদর্শন আমাদের যেমন মনে করিয়ে দেয় তেমনি সমাজে অনেকেই তোমাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এবং তা চিরদিন স্মরণ করবে।

ooooo

প্রিয় ভাই, দেখতে দেখতে চারটি বছর চলে গেলো তুমি আমাদের মাঝে নেই। তোমাকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে স্মরণ করি।

চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী



প্রয়াত আলফ্রেড গমেজ
জন্ম : ১৭ মে, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৭ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

পরিবারের পক্ষে–
কানন গমেজ

গমেজ বাড়ি, শুলপুর ধর্মপল্লী
সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।

বিজ্ঞ/১৯৫/২৬

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র
২০২৬-এর বড়দিন সংখ্যার জন্য
লেখা আহ্বান!

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!!

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা নিবেন। এ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর "বড়দিন সংখ্যা ২০২৬" নতুন আঙ্গিকে ও নতুন পরিসরে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। তাই বড়দিন সংখ্যা ২০২৬ এর জন্য আপনার সুচিন্তিত লেখা (প্রবন্ধ ও নিবন্ধ, গল্প, স্মৃতিকথা, স্বাস্থ্য সমাচার, কবিতা ও কলাম) বিভাগ উল্লেখপূর্বক (খোলা জানালা, সাহিত্য মঞ্জুরী, যুব তরঙ্গ, মহিলাঙ্গণ) পাঠিয়ে দিন আগামি ১৫ নভেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী:

১. যে কোন লেখায় উদ্ধৃতি বা কোন তথ্য সহায়তা নিলে তার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তথ্যসূত্রও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।
২. আপনাদের লেখা পূর্বে কোথাও ছাপানো হয়ে থাকলে, তা জানাতে হবে অর্থাৎ কোথায়, কখন ছাপানো হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা 'সৌজন্যে' লিখতে হবে।
৩. লেখা কম্পোজ করে, Sutonny MJ ফন্টে এবং MS Word 97-2003 Document-এ পাঠাতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণ করা হয়, তবে তা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৪. মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থী, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি, কিংবা নাম উল্লেখ করে কোন লেখা, তা ছাড়া মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও মূল্যবোধ ক্ষুন্ন হয় এমন লেখা পরিহার যোগ্য।
৫. লেখা মান সম্মত হলেই কেবল ছাপানো হয়।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার,
ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
অর্ঘ্য রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ৩৬
১১ অক্টোবর - ১৭ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
২৬ আশ্বিন - ০১ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ



সম্পাদকীয়

অনুপ্রেরণার স্মৃতিভাণ্ডার ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী ও হ্যারিংটন ভবন

কিছু স্থান কখনোই শুধু স্থান হয়ে থাকে না; কিছু ভবন কেবল ইট-পাথরের অবকাঠামো নয়। সময়ের প্রবাহে সেগুলো হয়ে ওঠে মানুষের জীবন গঠনের নীরব সাক্ষী, স্বপ্নের আশ্রয় এবং প্রীতিময় স্মৃতির সূতিকাগার। বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী ও নটরডেম কলেজের হ্যারিংটন ভবন তেমনই দুটি স্মৃতিবিজড়িত স্থান।

দুটি প্রতিষ্ঠান ভিন্ন উদ্দেশ্য ও পরিসরে কাজ করলেও তাদের মূল লক্ষ্য এক–শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে গড়ে তোলা এবং সেবার পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করা। ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী কাথলিক খ্রিস্টানদের একটি ধর্মীয় শিক্ষালয়, যেখানে কিশোরেরা যাজকীয় আহ্বানকে উপলব্ধি করে জ্ঞান, বিশ্বাস, প্রার্থনা, শৃঙ্খলা ও মানবিকতায় নিজেদের গড়ে তোলে। ভবিষ্যতে যাজক হয়ে ঈশ্বরের গৌরব ও মানুষের কল্যাণে নিজেদের জীবন নিবেদন করাই তাদের প্রস্তুতির অন্যতম লক্ষ্য।

অন্যদিকে নটরডেম কলেজের হ্যারিংটন ভবন এমন একটি শিক্ষাঙ্গনের অংশ, যেখানে বিভিন্ন ধর্মের যুবকেরা জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি নিজেদের চিনতে, নিজেদের সামর্থ্য আবিষ্কার করতে এবং দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে জীবন গড়ে তুলতে শেখে। এখানেও শিক্ষা কেবল পরীক্ষায় ভালো ফল করার বিষয় নয়; বরং মূল্যবোধ, চরিত্র ও মানবিকতার বিকাশের পথ।

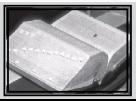
এই দুই ভবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অসংখ্য কিশোর-যুবকের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এখানে তৈরি হয়েছে বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও গভীর সম্পর্ক; জন্ম নিয়েছে স্বপ্ন, প্রত্যাশা ও আত্মনিবেদনের প্রেরণা। তাই ভবনগুলো শুধু স্থাপত্য নয়–এগুলো জীবন্ত স্মৃতিভাণ্ডার। সময়ের প্রয়োজনে ভবন সংস্কারিত হয়, নতুন সাজে সজ্জিত হয়; কিন্তু মানুষের হৃদয়ে গেঁথে থাকা স্মৃতিগুলো কখনো পুরোনো হয় না।

বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীর শতবর্ষ উদ্‌যাপন সেই সত্যকে নতুন করে অনুভব করিয়েছে। শতবর্ষে সেমিনারী প্রাঙ্গণ সেজেছিল নতুন সাজে; কিন্তু তার চেয়েও বেশি সেজেছিল বর্তমান ও প্রাক্তন সেমিনারীয়ানদের মন। দূর-দূরান্ত থেকে প্রাক্তনরা ফিরে এসেছেন, নবীন-প্রবীণ একসূত্রে মিলিত হয়েছেন, পুরোনো সম্পর্ক নতুন প্রাণ পেয়েছে। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা প্রাক্তনদের মধ্যে জেগেছে একাত্মতার অনুভূতি। সেমিনারী ও ভবিষ্যৎ সেমিনারীয়ানদের আরও এগিয়ে নিতে অনেকেই নতুন করে দায়িত্ব ও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। এ যেন শত বছরের স্মৃতিকে আগামী দিনের দায়িত্বে রূপান্তরের এক অনন্য মুহূর্ত।

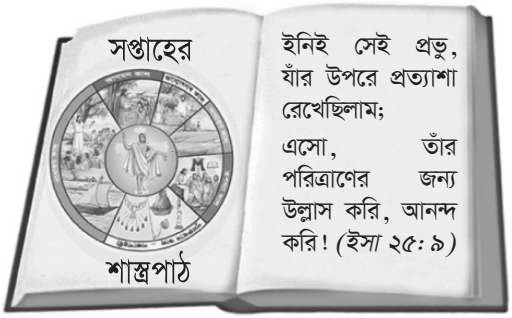
হ্যারিংটন ভবনও সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন সাজে সজ্জিত হবে, আরও অনেক শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করবে। নতুন প্রজন্ম সেখানে নতুন স্বপ্ন দেখবে, নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলবে, জীবনের পথচলার প্রস্তুতি নেবে। কিন্তু তাদের আগেও যারা সেখানে শিক্ষা ও গঠন লাভ করেছে, তাদের হৃদয়ে এই ভবনের স্মৃতি চিরসবুজ হয়ে থাকবে।

আজকের পরিবর্তনশীল সময়ে এমন শিক্ষালয়ের প্রয়োজন আরও বেশি–যেখানে কিশোর-যুবকেরা শুধু জ্ঞান অর্জন করবে না, বরং নিজেদের জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে শিখবে এবং সমাজ, মণ্ডলী ও মানবতার সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করার প্রেরণা পাবে।

ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী ও হ্যারিংটন ভবন তাই অতীতের স্মৃতির ধারক হয়েই থেমে থাকবে না; তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গঠন ও অনুপ্রেরণার কেন্দ্র হয়ে থাকুক। ভবন বদলাবে, প্রজন্ম বদলাবে, কিন্তু শিক্ষা, সম্পর্ক, ভালোবাসা ও সেবার যে উত্তরাধিকার তারা রেখে গেছে, তা যেন চিরজাগ্রত থাকে। †



বাস্তবিক অনেকেই আহূত, কিন্তু অল্পজনই মনোনীত। *(মথি ২২: ১৪)*



কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১১ অক্টোবর - ১৭ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

১১ অক্টোবর, রবিবার
সাধারণকালের ২৮তম রবিবার (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
ইসা ২৫: ৬-১০; সাম ২৩: ১-৩ক, ৩-৪, ৫-৬; ফিলে ৪: ১২-১৪, ১৯-২০; মথি ২২: ১-১৪ (সংক্ষিপ্ত ২২: ১-১০)

১২ অক্টোবর, সোমবার
সাধারণকালের ২৮তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
গালা ৪: ২২-২৪, ২৬-২৭, ৩১: ৫:১; সাম ১১৩: ১-৭; লুক ১০: ২৯-৩২

১৩ অক্টোবর, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ২৮তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
গালা ৫: ১-৩; সাম ১১৯: ৪১, ৪৩-৪৫, ৪৭-৪৮; লুক ১১: ৩৭-৪১

১৪ অক্টোবর, বুধবার
সাধারণকালের ২৮তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
সাধু প্রথম কালিস্তুস, পোপ ও ধর্মশহীদ
গালা ৫: ১৮-২৫; সাম ১: ১-৪, ৬; লুক ১১: ৪২-৪৬

১৫ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ২৮তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
এফে ১: ১-১০; সাম ৯৮: ১-৬; লুক ১১: ৪৭-৫৪

১৬ অক্টোবর, শুক্রবার
সাধারণকালের ২৮তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
সাধু হেডিভিগ, সন্ন্যাসব্রতী
সাধ্বী মার্গারেট মেরী আলাকুক, কুমারী
এফে ১: ১১-১৪; সাম ৩৩: ১-২, ৪৫, ১২-১৩; লুক ১২: ১-৭

১৭ অক্টোবর, শনিবার
সাধারণকালের ২৮তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
এফে ১: ১৫-২৩; সাম ৮: ১-৬; লুক ১২: ৮-১২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১১ অক্টোবর, রবিবার
+ ১৯৭৩ সি. এম জর্জ, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ সি. মেরী সেলিন, এমসি
+ ১৯৯৬ মাদার লুই, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

১২ অক্টোবর, সোমবার
+ ১৯৯৮ ফা. আলবিনো মিক্লাউচিস্, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৯ মাদার লুইজা পেন্নাতি, এসসি (ঢাকা)

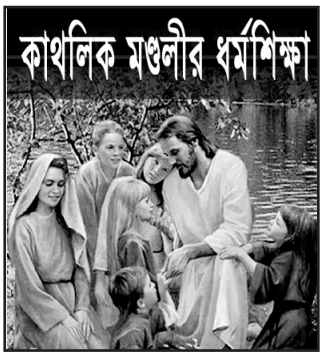
১৩ অক্টোবর, মঙ্গলবার
+ ২০১৪ সি. ফ্রান্সিসকা রোজারিও, এসসি (ঢাকা)
+ ২০১৭ ফা. বেঞ্জামিন কস্তা, সিএসসি (ঢাকা)

১৪ অক্টোবর, বুধবার
+ ১৯৭৪ মঁসিনিয়র ইসিদোর দ্যা কস্তা, (ঢাকা)
+ ১৯৭৪ ফা. ভালেরিয়ানো কব্বে, এসএক্স (খুলনা)

১৫ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৪৫ সি. জেভিয়ার, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

১৬ অক্টোবর, শুক্রবার
+ ১৯৬২ সি. এম. ইউজিন গ্রেনিয়ের, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৯ মাদার আল্‌ফন্স লাটোর, এলইচসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৮ ব্রা. রনাল্ড এফ. ড্রাহজাল, সিএসসি (ঢাকা)

১৭ অক্টোবর, শনিবার
+ ১৯৯১ সি. মেরী ফ্রান্সিস, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১০ ফা. ক্রুনো আলদো নিয়ার্নিয়েরো, এসএক্স (খুলনা)



তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

২২৯৩ মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং ব্যবহারিক গবেষণা হচ্ছে সৃষ্টির উপর মানুষের কর্তৃত্ব প্রকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা মূল্যবান সম্পদ হয়ে ওঠে যখন তা মানুষের সেবায় এবং সকলের মঙ্গলের জন্য সমন্বিত উন্নয়নে ব্যবহার করা হয়। অস্তিত্ব এবং মানব উন্নয়নের অর্থ প্রকাশ করার জন্য এগুলোর নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের কল্যাণের জন্যই, তাই মানুষই তাদের উৎপত্তি এবং অগ্রগতির উৎস, সুতরাং তাদের উদ্দেশ্যে এবং সীমাবদ্ধতার চেতনা নিহিত আছে মানব ব্যক্তি এবং তার নৈতিক মূল্যবোধেরই মধ্যে।

২২৯৪ বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে নৈতিক নিরপেক্ষতার দাবী একটি বিভ্রান্তি। অপরদিকে, কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত দক্ষতা, অপরের ক্ষতির বিনিময়ে কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধি, আর বিশেষ করে প্রচলিত মতবাদের ভিত্তিতে কোন মৌলিক নীতি নির্ধারিত হতে পারে না। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যাকে স্বভাবতঃই শর্তহীনভাবে মৌলিক নৈতিকতার মানদণ্ড স্বীকার করতে হবে। এগুলো মানুষের সেবায়, তার অনস্বীকার্য অধিকার, তার প্রকৃত ও সমন্বিত মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যবহৃত হতে হবে।

২২৯৫ মানুষের উপর গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ যদি মানবমর্যাদা ও নৈতিক আইনের বিরুদ্ধে হয়, তবে তা বৈধ হতে পারে না। ব্যক্তির সম্ভাব্য সম্মতি এরূপ ন্যায়সঙ্গত করে না। মানুষের উপর পরীক্ষ-নিরীক্ষ নৈতিকভাবে বৈধ হবে না যদি তার ফলে ব্যক্তির জীবন অথবা তার দৈহিক ও মানসিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য মাত্রাতিরিক্ত বা পরিহারযোগ্য ঝুঁকির আশ্রয় নেয়া হয়। মানুষের উপর পরীক্ষ-নিরীক্ষ মানব-মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না যদি তা ব্যক্তির অথবা যারা আইনগতভাবে তার পক্ষে কথা বলা তাদের সুবিবেচিত সম্মতি ছাড়া করা হয়।

২২৯৬ অঙ্গ প্রতিস্থাপন নৈতিক বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যদি যিনি অঙ্গদান করবেন তার দৈহিক ও মানসিক ক্ষতি ও ঝুঁকির পরিমাণ অঙ্গ-গ্রহীতার ঈপ্সিত মঙ্গলেন সমানুপাতিক হয়। মৃত্যুর পরে অঙ্গদান একটি প্রশংসনীয় কাজ এবং উদার সংহতির প্রকাশ হিসেবে উৎসাহিত করতে হবে। যদি দাতা বা যারা আইনতঃ তার পক্ষে বলার অধিকার পেয়েছে তারা তাদের সুস্পষ্ট সম্মতি দান না করে তাহলে নৈতিকভাবে ন্যায়সঙ্গত হবে না। উপরন্তু, সরাসরি কাউকে অঙ্গচ্ছেদ করে পঙ্গু করা বা মৃত্যু ঘটানো নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় – এমন কি তা যদি করা হয় গ্রহীতার মৃত্যু বিলম্বিত করার উদ্দেশে।

দৈহিক অখণ্ডতার প্রতি মর্যাদা

২২৯৭ অপহরণ ও পণবন্দীকরণ সন্ত্রাসের রাজত্ব বয়ে আনে। ত্রাসের সৃষ্টি করে তারা মানুষকে চাপের মুখে ফেলে দেয়। সন্ত্রাসবাদ যে ভয়ভীতি, ক্ষত নির্বিচারে হতাহতের ঘটনা সৃষ্টি করে তা গুরুতররূপে ন্যায্যতা ও ভালবাসার বিরুদ্ধে কাজ। দোষের স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য, দোষীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য, বিরোধীক্ষকে ভয় দেখানোর জন্য অথবা ঘৃণার মনোভাবেকে চরিতার্থ করার জন্য দৈহিক ও নৈতিক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নির্যাতন মানব-ব্যক্তি ও মানবীয় মর্যাদার বিরুদ্ধে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসা-ব্যবস্থার কারণ ব্যতীত সরাসরি নির্দোষ মানুষের অঙ্গকর্তন, অঙ্গচ্ছেদ এবং বন্ধ্যাত্বকরণ নৈতিক বিধানের বিরুদ্ধে কাজ।

২২৯৮ অতীতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে বৈধ সরকার কর্তৃকও সাধারণতঃ নিষ্ঠুর পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো, কিন্তু খ্রীষ্টমণ্ডলীর পালকরা প্রায়ই কোন প্রতিবাদ করতেন না। কেননা তারা নিজেরাই নিজেদের আদালতে নির্যাতনের ব্যাপারে রোমীয় আইনের ব্যবস্থা অনুসরণ করেছিলেন। ঘটনাগুলো দুঃখজনক বটে, তবে খ্রীষ্টমণ্ডলী সর্বদাই দয়া এবং ক্ষমা প্রদর্শনের দায়িত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়। তার যাজকদের সে রক্তপাত ঘটাতে নিষেধ করেছে। সম্প্রতি ইহা প্রমাণিত হয়েছে যে ঐ নিষ্ঠুর পদ্ধতিগুলো গণশৃঙ্খলার জন্য প্রয়োজন ছিল না এবং মানব-ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত অধিকারের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণও ছিল না। পক্ষান্তরে, এ ধরনের কাজ অনেকের আরো নীচে নামিয়ে দিয়েছে। এগুলো বিলোপ সাধনের জন্য কাজ করা প্রয়োজন। এসব ভুক্তভোগী এবং তাদের নির্যাতনকারীদের জন্য আমাদের অবশ্যই প্রার্থনা করতে হবে।

ঐতিহ্যবাহী ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উদ্‌যাপন



শতবর্ষ বা একটি শতাব্দী কেবল কালপ্রবাহের একটি সংখ্যাগত মাইলফলকই নয়, এটি দীর্ঘ পথ পরিক্রমার এক অনন্য গৌরবগাথা। একটি শতবর্ষের সময়কাল মানে একটি শতাব্দীর সাফল্য, বিবর্তন এবং ত্যাগের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। শতাব্দীর এই ধারাবাহিকতায় ঢাকার নবাবগঞ্জে অবস্থিত বান্দুরার ইছামতি নদীর তীরে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী পদার্পণ করল তার শততম বর্ষে। আর তারই শততম জুবিলী উদ্‌যাপন নিয়ে থাকছে এই বিশেষ প্রতিবেদন।

ঐতিহ্য, গৌরব আর ভালোবাসার এক শতাব্দী পেরিয়ে; অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হলো ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর শতবর্ষের গৌরবময় জয়ন্তী উৎসব-২০২৬ এবং সেই সাথে ছিল প্রতিষ্ঠানের প্রতিপালিকার পর্বদিবস। বিগত ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে এই বছর পর্যন্ত, দীর্ঘ প্রস্তুতির পর ১ থেকে ২ অক্টোবর, দুই দিনব্যাপী আয়োজিত এই ঐতিহাসিক উৎসবকে ঘিরে পুরো সেমিনারী প্রাঙ্গণ ও এর আশপাশের এলাকায় এক অভূতপূর্ব মিলনমেলার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যক্তিবর্গ ও প্রাক্তন সেমিনারিয়ানরা স্মৃতির টানে ছুটে আসেন এই জুবিলীর অংশী হতে। রঙিন আলোকসজ্জা, তোরণ, ব্যানার আর ফেস্টুনে সেজেছিল পুরো চত্বর।

এই শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসবের মূল ভাবনা ছিল 'স্মৃতিতে বান্দুরা সেমিনারী'। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শতবর্ষের এই ঐতিহাসিক ক্ষণটিকে স্মরণীয় করে রাখা হয়।

উৎসবের প্রথম দিন, অর্থাৎ ১ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) অনুষ্ঠানমালা মূলত যাজকদের জন্য নির্ধারিত ছিল। এদিন বিকেল ৪টায় বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত যাজকদের আগমন ও রেজিস্ট্রেশনের মধ্য দিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটে। সন্ধ্যায় 'পবিত্র ঘণ্টা' প্রার্থনার মাধ্যমে প্রথম দিনের আয়োজন সফলভাবে শেষ হয় এবং এর পরপরই শুরু হয় "স্মৃতিতে বান্দুরা সেমিনারী" শীর্ষক বিশেষ আড্ডা ও সহভাগিতা। যেখানে যাজকরা সেমিনারীর অতীত গৌরব ও সোনালী দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করেন।

দ্বিতীয় দিন, ২ অক্টোবর (শুক্রবার) উৎসব প্রাঙ্গণে যাজক, খ্রিস্টভক্ত, প্রাক্তন সেমিনারিয়ান ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে। সকাল ৯টায় বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর শতবর্ষের জয়ন্তী উৎসবের ফলক উন্মোচন ও প্রদীপ প্রজ্বলন এবং শান্তির পায়রা উড়িয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। এ সময়ে উদ্বোধনী নৃত্যের মধ্য দিয়ে সবাইকে বরণ করে নেয়া হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ কেভিন রান্ডাল, বিশপ সুব্রত বি. গমেজ, বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি, সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, মন্সিনিয়র গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীর পরিচালক ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই সহ আগত যাজকবৃন্দ, প্রাক্তন ও বর্তমান সেমিনারিয়ানগণ এবং খ্রিস্টভক্তগণ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সকাল ৯:৩০ মিনিটে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। পুণ্যবেদিতে এ সময়ে সহায়তা করেন আর্চবিশপ কেভিন রান্ডাল-সহ অন্যান্য বিশপ ও যাজকগণ। তিনি তার উপদেশবাণীতে ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অতি প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেন।

তিনি উপদেশবাণীতে বলেন, আজ থেকে একশো বছর আগে, ঢাকা থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে এই বান্দুরাতে তিন একর জায়গার উপরে যাজকদের গঠন ও শিক্ষার জন্য এই ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীর জন্ম হয়েছিল। সময়ের বিবর্তনে অনেক স্থাপনাতে, কাঠামোগত অনেক কিছুতেই পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য একই রয়ে গেছে। আগামী যাজকদের নৈতিক, সার্বিক শিক্ষা ও জীবনের সুদৃঢ় গোড়াপত্তনি এই সেমিনারীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এখনো একই লক্ষ্যে অবিচলভাবে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ফাদার ডেলোনি, যে ঘরে থাকতেন, তাঁর সেই স্থানটিকে ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী বলা শুরু করেন। তখনকার সময় ৩ অক্টোবর ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব পালন করা হতো। একশো বছর আগে একই বছরে অক্টোবর মাসে ৩ তারিখে ক্ষুদ্র পুষ্প তেরেজার পর্বদিনে তাঁর ঐ ঘরটিকে অর্থাৎ এ ক্ষুদ্র এলাকাটিকে ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী নামকরণ করেন। তখন চারজন ভাগ্যবান সেমিনারীয়ান; মাইকেল ডি কস্তা, যাকব দেশাই, বেনেডিক্ট রাকসাম এবং শিমন ফেটা'কে ক্যাসাক প্রদানের মধ্য দিয়ে মহাসমারোহে সেমিনারীর যাত্রা শুরু হয়েছিল। তখন ঢাকা ধর্মপ্রদেশের বিশপ ল্যাঁগ্রা এত বড় কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর ভিকার জেনারেল ফাদার তিমথি ক্রাউলি, তিনি জানতেন এবং ফাদার ডেলোনিকে অনুমোদনও দিয়েছিলেন। এরপর থেকে ফাদার ডেলোনি ঘর নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা শুরু করেন এবং তিনি বিশজনের জন্য একটা সেমিনারী তৈরি করেন। তবে সমস্যা ছিল যে, বিশপ এই ব্যাপারে অবগত না এবং সেইসাথে আশীর্বাদও করতে হবে। তাই বিশপকে নিমন্ত্রণ

দেওয়া হয়েছিল। বিশপ ল্যাঁগ্রা নিমন্ত্রণ পেয়ে আসেন এবং ফাদার তিমথি ও ফাদার ডেলোনি বিরাট ভোজের আয়োজন করেন। ভোজের পর বিশপকে সেমিনারী দেখানো হয়। বিশপ সেমিনারীটি দেখে বিস্মিত ও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, ফাদার ডেলোনি যে কাজটি করেছেন তা ঢাকার বিশপের করতে অনেক বছর সময় লাগতো। অর্থাৎ বিশপ না জেনেও এটাকে ভালো কাজের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সেজন্য ফাদার ডেলোনি এই কার্যক্রমটিকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। সেমিনারীর প্রথম পরিচালক ছিলেন ফাদার ডেলোনি। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল এবং উদার মনের মানুষ। আবার নিয়মে দিক দিয়ে তিনি ছিলেন কঠোর। তিনি সেমিনারিয়ানদেরকে সবদিক দিয়েই যত্ন নিতেন। ফাদার ডেলোনির পরে আরো অনেক পরিচালকগণ সেমিনারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ধীরে ধীরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ছেলেরা সেমিনারীতে এসে যোগ দিতে থাকে।

এছাড়া তিনি আরো বলেন, ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর মধ্য দিয়ে ছাত্ররা পড়াশুনার মাধ্যমে তাদের যাজকীয় জীবনের লক্ষ্য নিয়ে এখানে এসেছিলেন এবং এর মধ্য থেকে অনেকেই যাজক না হতে পারলেও আজ অনেকেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। কেউ রাজনীতিবিদ, কেউ সামাজিক নেতৃত্বে, কেউ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আজ পরিবার গঠনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পবিত্র খ্রিস্টযাগ শেষে শতবর্ষের বিশেষ স্মরণিকা 'পুষ্পিত শতাব্দিকা' উন্মোচন করা হয় এবং এ সময়ে পোপীয় বাণী পাঠ করে শুনান আর্চবিশপ কেভিন রান্ডাল। দুপুরে শুরু হয় উন্মুক্ত স্মৃতিচারণ পর্ব। যেখানে যাজকসহ প্রাক্তন ছাত্ররা তাদের পুরনো দিনগুলোর আবেগঘন স্মৃতি তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে এক সাক্ষাৎকারে মন্সিনিয়র গাব্রিয়েল কোড়াইয়া বলেন: আমি আজকের আমাদের এই বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীর শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসবের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক। আজকে আমাদের ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের জন্য তথা সমগ্র বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। ঠিক একশো বছর পূর্বে আমাদের এই সেমিনারী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তখনকার সময়ে সমগ্র বাংলাদেশে এই একটিমাত্র মাইনর সেমিনারী ছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ থেকে যুবকরা আসতো এবং এখানে এসে পড়াশোনাসহ যাজক হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিত। আজকে এই জুবিলীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ থেকে হাজার হাজার খ্রিস্টভক্তগণ এসেছেন। আজকের দিনে প্রাক্তন সেমিনারীয়ানরাও এই জুবিলীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। যাজকসহ তারাও তাদের ফেলে আসা দিনগুলো স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে সবার সাথে সহভাগিতা করেছেন। সকাল থেকেই সারাদিন আমাদের সকল কার্যক্রম সুন্দরভাবে চলছে।

বান্দুরা সেমিনারীর পরিচালক ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই এক সাক্ষাৎকারে বলেন: আজকের এই শতবর্ষ জুবিলী ও সেমিনারীর পর্বদিবসে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। আজকের দিনে জুবিলী ও পর্বদিবসকে ঘিরে সুন্দর আয়োজন ছিল। এই আয়োজন সার্থক হয়েছে। আমার খুবই ভালো লাগছে যে, আমি এই সেমিনারীর একজন সেমিনারীয়ান হিসেবে গঠন নিয়েছিলাম এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে এই শতবর্ষ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছি তার জন্য ঈশ্বরকে এবং মণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানাই। আজকের দিনে আমার অনুভূতি অনেক আনন্দের। কারণ এই আয়োজন করতে গিয়ে অনেক পরিশ্রম ও ধৈর্যের প্রয়োজন ছিল আর তা করতে পেরেছি। সর্বপরি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যারা প্রার্থনা, অর্থ ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন এবং সবশেষে ঈশ্বরকে আবারও ধন্যবাদ জানাই।

বিকেল ৪টায় শুরু হয় জমকালো 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যাফেল ড্র'। অনুষ্ঠানে স্থানীয় ইউএনও সহ আর্চবিশপ, বিশপগণ, যাজকবৃন্দ, প্রাক্তন সেমিনারিয়ান, খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বর্তমান সেমিনারীয়াগণ নৃত্য পরিবেশন করেন ও প্রাক্তন সেমিনারীয়ানগণ জারিগান পরিবেশন করেন। এছাড়াও আঠারগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মপল্লীর অংশগ্রহণে শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনার মাধ্যমে ঐতিহাসিক ও মহিমান্বিত উৎসবের সফল সমাপ্তি ঘটে।

পরিশেষে, শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক মন্সিনিয়র গাব্রিয়েল কোড়াইয়া ও সেমিনারীর পরিচালক ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই উৎসবটি সুন্দর ও সফলভাবে সম্পন্ন করায় দেশ-বিদেশ থেকে আগত সকল অতিথি, প্রাক্তন ছাত্র, শুভানুধ্যায়ী ও বিভিন্ন ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীর শতবর্ষ জুবিলীতে ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ কেভিন রান্ডাল-এর বাণী:

Little Flower Seminary
100 Year Anniversary

Most recently, Pope Leo XIV, when he addressed UNESCO, during his trip to France delved into the question of what it means to be human. He posed the question and then answered it with three facets, three concepts that I think are applicable to seminarian formation for service as a Christian priest in a multi-faith society like Bangladesh.

"What does it mean to be human? Every culture is challenged by this question, which lies at the heart of every form of knowledge, every art and every religion….Before all else, the human person is someone who is conceived and born. Thus, first of all, to be human means to be a child. None of us chose to be so. None of us decided from whom, when or where to be born. This evident truth sheds light on something that is not merely biological but ethical: as children, we are all brothers and sisters. From the outset, our humanity is a gift and a trial, a promise and a responsibility. For every human being, birth establishes a primordial bond — a communion of life that has its source, and its first educational setting, in the family.

Secondly, we are all born naked and in need. We are poor by birth, in need of bread and words, of care and affection — that is, of all that nourishes body and spirit. We know this well, and yet, as we become adults, we risk forgetting it. It is precisely those in need who suffer the greatest consequences of this forgetfulness, whenever their humanity is betrayed or cast aside, exploited or deceived. Forgetting the circumstances of our birth obscures the very idea of human life, because it detaches life from the history common to us all. Thus, life is no longer understood as a gift, but as a commodity. It is no longer viewed as

a summons to care and responsibility, but as a product to be exploited. Indeed, this tragic alternative reminds us that to be human is to be free by nature. Since all of us have been children, our freedom begins with our response to the freedom of the one who first turns to us whether with gestures of affection or rejection, of loving welcome or neglect and cruelty.

Thirdly, to keep alive the memory of our common humanity is to recognize its grandeur - that is, its immense potential — even though it is diminished by many forms of evil and injustice. Those engaged in the fields of education, science and culture are called all the more to care for every person, so that the beauty of our freedom may shine forth. This beauty has a name: justice. Freedom is indeed beautiful when it is oriented toward goodness and truth; it is disfigured when it descends into arbitrariness, violence or the thirst for power. To be human, then, implies a responsibility before history: the human being is one who grows, learns and works with both hands and mind. By that labor, we may cultivate the earth or disfigure it, create works of art or destroy them. At this particular juncture, we must recognize that the most terrible of "human works" is war, for then science itself is placed at the service of an inhumane will to destroy and to kill."

Dear Formators and seminarians, ladies and gentlemen, a seminary is the heartbeat of a diocese where men discern a call before God. What shall I do with my life? How shall I serve? In which vocation shall I serve? Like a child, I arrive here waiting to be formed in the image and likeness of Christ. I arrive naked and in need. Through education, science and culture I prepare to serve the People of God in Bangladesh and perhaps beyond. I use my freedom in human history to build up civil society and yet to remain a part from it. Ask any priest. It is exhausting and yet exhilarating. Please join us by going to the Major Seminary. You will help to shape lives of families and generations of Bangladeshis. You will go to sleep satisfied that you made a difference, not just in the lives of Catholics.

You will relate with Hindus, Buddhists, Muslims, and Protestants and non-believers. You will be a sign and symbol in civil society, a promise of eternal truth. Most recently published interreligious dialogue document from the Holy See, called a "Journey for Hope" reminds us in Article 56: "56. A richer and more nuanced model of dialogue is therefore not only desirable for the future, but is already beginning to take shape in the Church and in its relations with other religious traditions. This model, with its many facets, could be compared to a polyhedron: it requires engaging with multiple dimensions simultaneously, showing patience and clarity, as well as imagination and creativity. It is through this interaction that a shared future is built—one in which peace and friendship are no longer utopian ideals but the mature fruits of the encounter."

In your parishes you will become this beacon of light with patience and clarity, using your imagination and creativity, for we read in ***OPTATAM TOTIUS:*** "3. In minor seminaries erected to develop the seeds of vocations, the students should be prepared by special religious formation, particularly through appropriate spiritual direction, to follow Christ the Redeemer with generosity of spirit and purity of heart. Under the fatherly direction of the superiors, and with the proper cooperation of the parents, their daily routine should be in accord with the age, the character and the stage of development of adolescence and fully adapted to the norms of a healthy psychology."

Dear Seminarians, will you not accept the challenge of Pope Leo of discovering what it means to be human by serving as a Catholic priest in Bangladesh, first as a child of God, then naked, admitting your dependency by using your freedom to serve everyone, and lastly, by keeping alive the memory of a common humanity in the villages and towns through interreligious dialogue and synodality? I think that you are up to the task. This seminary has produced the finest of servants. You ought to be proud to be a part of its 100th anniversary.

May God bless you as you discern you call!

---

[1] Pope Leo XIV. Discorso durante la visita presso l'Organizzazione delle Nazioni Uniter per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), (25 settembre 2026), https://www.vatican.va/content/leo-xiv/en/speeches/2026/september/documents/20260925-francia-sede-unesco.html, accessed on 2 October 2026.

[2] **A JOURNEY OF HOPE Sixty Years of Interreligious Dialogue and Fraternity in the Light of the Conciliar Declaration *Nostra Aetate.*** Article 56, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20260916_nota-cammino-speranza_en.html, accessed on 2 October 2026.

[3] Pope Paul VI. DECREE ON PRIESTLY TRAINING ***OPTATAM TOTIUS*** (October 28, 1965), https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_optatam-totius_en.html, accessed on 2 October 2026.

বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীর শতবর্ষ জুবিলী ও প্রতিপালিকার পর্বে সেমিনারিয়ান, প্রাক্তন সেমিনারিয়ান, অভিভাবক এবং খ্রিস্টভক্তগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেদের আনন্দ অনুভূতি প্রকাশ করেন। তাদের আনন্দ অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে তাদের প্রত্যাশাও তুলে ধরেন তারা।

ইয়েন জন রিবেরু (সেমিনারিয়ান): আমরা মহাসমারোহে বান্দুরা সেমিনারীর শতবর্ষ জুবিলী উদ্‌যাপন ও প্রতিপালিকা ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার পার্বণ পালন করেছি। এই জুবিলীকে ঘিরে যে সকল প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল তা সবই সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। জুবিলীতে অনেক খ্রিস্টভক্তের আগমন ঘটে। আমি নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে করছি, কারণ শতবর্ষে আমি একজন বর্তমান সেমিনারীয়ান হিসেবে বান্দুরা সেমিনারীতে রয়েছি। তাই আমার অনুভূতি অনেক আনন্দের ও ঈশ্বরের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

একজন সেমিনারিয়ানের মা এই শতবর্ষ জুবিলীতে অংশগ্রহণ করতে পেরে তার অনুভুতি প্রকাশ করে বলেন: আমি অর্পিতা ব্রিজিতা রোজারিও, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী থেকে এসেছি। বান্দুরা সেমিনারীর শতবর্ষের জুবিলী ও প্রতিপালিকা ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্বে অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করছি। আমি আরো আনন্দিত যে, সেমিনারীর এই পবিত্রতম সময়ে আমার ছেলে মারভীন যোয়াকিম ক্রুশ বর্তমানে দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত একজন সেমিনারিয়ান। সকলের দীর্ঘ সময় ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এত সুন্দর একটি দিনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও তাঁর প্রশংসা করি। ঈশ্বর এমনভাবেই তাঁর গৌরব ও মহিমা প্রকাশের সুযোগ করে দেন এবং অনেকেই যেন প্রভুর সেবা কাজে নিজেদের নিবেদন করতে পারে এই প্রার্থনাই করি।

একজন প্রাক্তন সেমিনারিয়ান হিসেবে থিওফিল নকরেক তার মনের অভিব্যক্তি তুলে ধরে বলেন: বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী আমার জীবনের স্বপ্ন ছিল। আমি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি, সুদূর জলছত্র থেকে সারাদিন যাত্রা করে যখন বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীতে প্রথমবার পৌঁছি তখন আমার কাছে সবকিছু স্বপ্নের মতো মনে হয়েছে। আমি স্বর্গের মতো দেখেছি সেমিনারী প্রাঙ্গণ। প্রবেশ পথের মধ্যেই শ্রদ্ধেয় পরিচালকের অফিসের সামনে সাদা ও বেগুনি রঙের কসমস ফুলের বাগান ছিল। সন্ধ্যার সময়ে সেই ফুলের বাগান আজও আমাকে মুগ্ধ করে। ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে ৪২ বছর পর এই সেমিনারীর শতবর্ষ উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করছি। আমার এই জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব হয়েছে এই সেমিনারীতে পড়ার সুযোগ লাভের কারণেই। আমার দরিদ্র পরিবারের পক্ষে আমাকে পড়াশুনা করানোর সামর্থ ছিল না। তৎকালীন পরিচালক শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেল বি. রোজারিও আমাকে মাত্র ২০ টাকা মাসিক খরচ নিয়ে সেমিনারীতে থাকার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এখানকার শিক্ষা ও গঠন আমাকে সহায়তা করেছে সামনে এগিয়ে যাবার ও পথ চলার। সেমিনারীর পরিচালকবৃন্দের দায়িত্বশীল পরিচালনা, নৈতিক গঠন আমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য সহযোগিতা করেছে। সততা চর্চা, সময়নিষ্ট হওয়া, নিয়মানুবর্তিতা পরবর্তী জীবনে বড় প্রভাব ফেলেছে। আমার কর্মজীবনে আমি সর্বদা মনে করি যে বান্দুরা সেমিনারীর কঠোর নিয়ম কানুন আমাকে সহায়তা করেছে।

আরেকজন প্রাক্তন সেমিনারিয়ান ভিনসেন্ট প্রদীপ রিবেরু তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন: ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা নামটাই আমার কাছে খুব আবেগের ও ভালোবাসার নাম। আমার অনুভূতিতে এই নামের প্রতিষ্ঠানটি (ক্ষুদ্রপুষ্প বান্দুরা সেমিনারি) আরো বেশি আবেগের। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি বিকালে বাবার সাথে এই প্রতিষ্ঠানের গেট দিয়ে প্রবেশ করি এবং ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি পরীক্ষার পর জুন মাসে এ প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে রমনা সেমিনারিতে প্রবেশ করি। এই প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষ উদযাপন আমার কাছে সত্যিই খুব আনন্দের, আবেগের এবং গর্বের। একটি শতাব্দী প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি লম্বা ও সার্থক যাত্রা। এই যাত্রা পথের অনেক যাত্রী আধ্যাত্মিকভাবে ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। আমি নিজেও এই যাত্রাপথের একজন যাত্রী হতে পেরে খুব আনন্দিত ও গর্ববোধ করি। ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারির শিক্ষা, আদর্শ, ভালবাসা ও নৈতিকতা, আমার বাকি জীবনের আলোকবর্তিকা হয়ে দিকনির্দেশনা দান করুক; এই আমার প্রত্যাশা ও প্রার্থনা।

একজন প্রাক্তন সেমিনারিয়ান রিন্টু গমেজের স্ত্রী জেনী মারীয়া রোজারিও শতবর্ষ পূর্তিতে অংশগ্রহণ করতে পেরে বলেন: আমি বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীর শতবর্ষ জুবিলীতে স্বামী ও সন্তানসহ অংশগ্রহণ করেছি। আমি মনে করি অনুষ্ঠানটি সুন্দর, অর্থপূর্ণ ও সার্থক হয়েছে। আমার স্বামী রিন্টু গমেজ এই সেমিনারীর একজন প্রাক্তন সেমিনারিয়ান। সে এই সেমিনারী থেকে গঠন পেয়ে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে পরিবার ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। সত্যিই বাংলাদেশ খ্রিস্ট মণ্ডলী এই সেমিনারির প্রতি কৃতজ্ঞ। এখান থেকেই গঠন পেয়ে যাজকগণ যথাযথ নিয়ম মেনে চলে ধর্মপল্লী গুলো পরিচালনা করছেন। যারা যাজক হতে পারেনি তারাও আজ সমাজে ও মণ্ডলীতে প্রতিষ্ঠিত। আর্দশ স্বামী ও পিতা হিসেবে তারা পরিবারগুলো পরিচালনা করছে। শতবর্ষ পূর্তিতে যোগদানের মাধ্যমে আমার স্বামী ও সন্তানসহ সেমিনারটি ঘুরে দেখার সুযোগ পেয়েছি। এ যেন এক জীবন্ত অবকাঠামো, যা নিরবে সুন্দর মনের সৎ মানুষ গড়ার দায়িত্ব পালন করছে। দিনটি ছিল পবিত্রতার প্রতীক ও মিলন মেলা। আমার স্বামীর সহপাঠীদের সাথে পরিচিত হতে পেরেছি এবং আলাপচারিতা করতে পেরেছি। এই স্মরণীয় আনন্দপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমার সন্তানেরা উচ্ছ্বসিত ছিলো। সুন্দর ও স্বার্থক হোক ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর শতবর্ষের পথচলা।

উল্লেখ্য শতবর্ষের এই উৎসবে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছিল ভক্তজনগণ। ১জন আর্চবিশপ, ৩জন বিশপ, ষাট উর্ধ্ব যাজক, বেশ সংখ্যক ব্রাদার-সিস্টার ও পচিঁশ শতাধিক খ্রিস্টভক্তের উপস্থিতি বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীর শতবর্ষ সত্যিই এক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায়, বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী প্রতিটি ধর্মপ্রদেশীয় যাজক, সেমিনারিয়ান এবং প্রাক্তন সেমিনারিয়ানদের জন্য মাতৃগৃহ। এই মাতৃগৃহে থেকে আধ্যাত্মিক, দৈহিক ও মানবিক গঠন লাভ করে কেউ আজ যাজক হয়েছেন আবার কেউ আহ্বান জীবন থেকে সরে গিয়েও মণ্ডলী ও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত রয়েছেন। অর্থাৎ বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী খ্রিস্টমণ্ডলীতে প্রতিটি কর্মকাণ্ডে অনেক বড় ভূমিকা পালন করছে এবং করে যাচ্ছে। তাই এই শততম বর্ষ হোক নতুন এক পথ চলা এবং আগামী দিনগুলোতেও যেন সেমিনারী তার নিজস্ব ঐতিহ্য ধরে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে চলে।

প্রস্তুতকারক: *নব যোয়াকিম কস্তা।*

বিশেষ প্রতিবেদন

একশ' বছরের প্রদীপঃ বান্দুরার ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীর শতবর্ষ শুধু যাজক নয়, গড়েছে নেতৃত্বও

জ্যাষ্টিন গোমেজ

ঢাকা থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে, ইছামতি নদীর শান্ত জলধারার তীরে ছোট্ট জনপদ বান্দুরা। এক সময়ের এই প্রত্যন্ত গ্রামেই ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান হলিক্রশ মিশনারী ফাদার জন ব্যাপ্টিস্ট ডেলোনী গড়ে তুলেছিলেন একটি যাজকীয় গঠন গৃহ, ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী। ঢাকার তৎকালীন ফরাসী বিশপ আরমান্দ ল্যাগ্রান্ডের উৎসাহেই স্থানীয় যাজক তৈরির এই স্বপ্ন বাস্তব রূপ পায়। শুরুতে ময়মনসিংহ ও ভাওয়াল অঞ্চলের, বিশেষত গারো জনগোষ্ঠীর কিশোরদের নিয়ে যাত্রা শুরু হওয়া এই প্রতিষ্ঠান আজ বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী কাথলিক গঠন গৃহ হিসেবে স্বীকৃত।



শত বছর আগে যে ছোট্ট দ্বিতল ভবনে হাতে গোনা কয়েকজন কিশোর প্রথম পা রেখেছিল, সেখান থেকেই পরবর্তীতে বেরিয়ে এসেছেন পাঁচজন আর্চবিশপ, পাঁচজন বিশপ, সাতজন মনসিনিয়র, ১৬৯ জন যাজকসহ মোট ১৯১ জন যাজকীয় ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এই সংখ্যাই সব নয়। এখানে গড়ে ওঠা শত শত তরুণ পরবর্তীতে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন, কেউ হয়েছেন শিক্ষক, কেউ ব্যাংকার, কেউ সরকারি কর্মকর্তা, কেউ সমাজকর্মী, এমনকি একজন হয়েছেন জাতীয় সংসদ সদস্য ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীও। সেমিনারীর পাশেই ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বান্দুরা হলিক্রশ উচ্চ বিদ্যালয়ে সেমিনারিয়ানরা পড়াশোনা করতেন, যা এই এলাকার শিক্ষা বিস্তারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

এই বছর সেমিনারীটি তার শতবর্ষ উদ্‌যাপন করছে। এই বিশেষ মুহূর্তে সেমিনারীর সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষদের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলে জানার চেষ্টা করা হয়েছে, কীভাবে একটি প্রত্যন্ত এলাকার ছোট্ট গঠন গৃহ শতাব্দী জুড়ে বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছে, এবং কীভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে এর দেয়ালের ভেতরের জীবনযাত্রা। চলুন তাহলে দেখা যাক, বিশপ থেকে শুরু করে যাজক, প্রাক্তন সেমিনারিয়ান এবং বর্তমান শিক্ষার্থীরা এই সেমিনারী সম্পর্কে কী বলছেন।

আহ্বান কমলেও থেমে নেই যাত্রা

ফাদার ঝলক আন্তুনি দেশাই (৩৭)

পরিচালক, ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী

পরিচালক ফাদার দেশাই জানান, বর্তমানে সেমিনারীতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বায়ান্নজন সেমিনারীয়ান পড়াশোনা করছেন। শিক্ষার্থীরা নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয় এবং দশম শ্রেণি শেষে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য অন্যত্র চলে যায়। এক সময় সারা দেশ থেকে শতাধিক সেমিনারিয়ান এখানে আসতেন, কিন্তু এখন দেশের প্রায় প্রতিটি ধর্মপ্রদেশেই নিজস্ব মাইনর সেমিনারী গড়ে উঠেছে, ফলে বান্দুরার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমে এসেছে।

সংখ্যা কমে যাওয়ার পেছনে আরও কিছু কারণ চিহ্নিত করেন ফাদার দেশাই। তার মতে, ছোট পরিবার এবং উন্নত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিই আহ্বান কমে যাওয়ার প্রধান কারণ। "অভিভাবকরা এখন সন্তানকে পেশাগত জীবনে সফল দেখতে বেশি আগ্রহী, যাজক হিসেবে দেখার চেয়ে," বলেন তিনি। তা সত্ত্বেও তিনি মনে করেন, সেমিনারীর মূল দর্শন এখনো অক্ষুণ্ন আছে, এটি কেবল যাজক তৈরির প্রতিষ্ঠান নয়, বরং মানুষ গড়ার একটি গৃহ।

আর্থিক দিক নিয়ে তিনি বিস্তারিত জানান, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের পাশাপাশি স্থানীয় ও বিদেশি দাতাদের সহায়তায় সেমিনারী পরিচালিত হয়। অধিকাংশ সেমিনারিয়ানের পরিবার সামর্থ্য অনুযায়ী মাসে ৫০০ থেকে ২,০০০ টাকা পর্যন্ত অবদান রাখে। "সামর্থ্যহীন পরিবারের সন্তানরা কোনো অর্থ দিতে পারে না," তিনি আরও যোগ করেন।

দুটি লক্ষ্য নিয়ে সেমিনারীর যাত্রা

বিশপ থিওটনিয়াস গমেজ (৮৭)

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী বিশপ

কিশোর বয়সে, পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময়েই ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীতে ভর্তি হয়েছিলেন থিওটনিয়াস গোমেজ। সেটা ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে, সেমিনারী প্রতিষ্ঠার মাত্র পঁচিশ বছর পর। এরপর টানা ছয় বছর তিনি এই গঠন গৃহে কাটিয়েছেন, এমন এক সময়ে যখন প্রতিষ্ঠানটি নিজেই সবে তার শৈশব পার হচ্ছিল।

বিশপ গোমেজ জানান, শুরুর দিকে এই সেমিনারীর উদ্দেশ্য ছিল দ্বিমুখী। একদিকে গারো জনগোষ্ঠীর মধ্যে মণ্ডলীর বিস্তৃত মিশন কাজের জন্য কাটেখিস্ট তৈরি করা প্রয়োজন ছিল, অন্যদিকে ভবিষ্যতে যাজক হতে পারে এমন বালকদের বেছে নিয়ে তাদের গড়ে তোলার লক্ষ্যও ছিল। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্যাটেখিস্ট তৈরির কাজ ধীরে ধীরে কমে আসে এবং যাজকীয় গঠনই সেমিনারীর মূল ও একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত হয়। "সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যাজকীয় গঠনই সেমিনারীর মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়," বলেন তিনি।

তবে বিশপ গোমেজ স্পষ্ট করেই বলেন, এখানে আসা প্রত্যেক ছেলের যাজক হওয়ার কথা ছিল না। "কিন্তু এখানে আসা সবাইকে যে যাজক হতে হবে, এমনটা ছিল না," মন্তব্য করেন তিনি। তার নিজের ব্যাচেই এমন অনেক সহপাঠী ছিলেন যারা যাজকীয় গঠন মাঝপথে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তার ভাষায়, তারা প্রত্যেকেই পরবর্তীতে সুন্দর পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়ে তুলেছেন, এবং যারা অভিষিক্ত হয়েছেন তাদের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব আজও অটুট আছে। এই বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধই প্রমাণ করে, সেমিনারী কেবল যাজক তৈরির প্রতিষ্ঠান ছিল না, বরং একটি পরিবার ছিল যেখানে সবাই একসঙ্গে বেড়ে উঠেছেন। বিশপ গোমেজ আরো যোগ করে বলেন, "একভাবে বা অন্যভাবে, এই সেমিনারী দেশের কাথলিক মণ্ডলীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।"

পরিবারের চেয়েও বেশি শিখিয়েছে সেমিনারী

ফাদার প্রশান্ত থিওটনিয়াস রিবেরু (৭৪)

প্রবীণ যাজক, মণ্ডলীর আইন বিশেষজ্ঞ

গাজীপুর জেলার এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম নেওয়া ফাদার রিবেরু ছয় ভাইয়ের মধ্যে সবার বড়। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি সেমিনারীতে ভর্তি হন, তখন বান্দুরায় পৌঁছানোই ছিল একটি দুঃসাধ্য যাত্রা। খালি পায়ে হেঁটে, লঞ্চে চড়ে এবং শেষ পথটুকু ঘোড়ার গাড়িতে চেপে তিনি বান্দুরায় পৌঁছান।

সেমিনারীর জীবনও ছিল কঠোর নিয়মে বাঁধা। নদীতে গোসলের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র বিশ মিনিট, আর বাড়িতে চিঠি লেখার জন্যও লাগত যাজকের বিশেষ অনুমতি। তবে এই কঠোরতার মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা। তিনি বলেন, "সেমিনারী আমাকে পরিবারের চেয়েও বেশি নৈতিকতা, সময়ানুবর্তিতা, নম্রতা ও শৃঙ্খলা শিখিয়েছে"। তার ভাষায়, তৎকালীন পরিচালক তাকে যে সময়ানুবর্তিতা ও নম্রতার শিক্ষা দিয়েছিলেন, তিনি তা পরিবার থেকে পাননি।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ২৭ ডিসেম্বর যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হওয়া ফাদার রিবেরু পরবর্তীতে টানা ২৭ বছর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মেজর সেমিনারীতে মণ্ডলীর আইন পড়ান, নতুন প্রজন্মের যাজকপ্রার্থীদের গড়ে তুলছেন ঠিক যেভাবে একদিন তাকে গড়ে তোলা হয়েছিল। তিনি বলেন, ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীতে না এলে তার জীবন আজ কেমন হতো, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। তিনি আরও উল্লেখ করেন, তার সমসাময়িক অনেক সহপাঠী যাজক না হয়েও ব্যাংকার, শিক্ষক ও সমাজকর্মী হিসেবে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

শুধু যাজক নয়, সমাজেরও নেতা

এলয়সিয়াস মিলন খান (৭৮)

অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ১৪ বছর বয়সে বাবার সঙ্গে নৌকায় চড়ে গ্রাম থেকে বান্দুরায় আসেন খান। "বাবা আমাকে পরিচালকের হাতে তুলে দিয়েই ফিরে গিয়েছিলেন। সেটাই ছিল আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের শুরু," স্মৃতিচারণকালে তিনি এ কথা বলেন।

তখন সেমিনারীতে বিদ্যুৎ ছিল না, ঠিক যেমনটা ছিল না তার নিজের গ্রামেও। ছাত্ররা হ্যাজাক বাতির আলোয় পড়াশোনা করত, নদীতে গোসল করত, আর ভোর পাঁচটার ঘণ্টা থেকে রাত দশটায় আলো নেভা পর্যন্ত পড়াশোনা, প্রার্থনা, খেলাধুলা, কাজ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ভরা এক শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সাদাসিধে জীবনযাপন করত তারা। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে বাধ্যতামূলক লাতিন ভাষা এতটাই কঠিন ছিল যে অনেকেই তা পাশ করতে না পেরে সেমিনারী ছেড়ে দিত। স্মৃতিচারণ করে খান বলেন, "জীবন কঠিন ছিল, কিন্তু সেটা ছিল এক দুর্দান্ত শিক্ষার অভিজ্ঞতা। সেই সময়ে যা শিখেছি, তার সবকিছুই পরবর্তী জীবনে সম্পদ হয়ে উঠেছে।"

পাঁচ বছর সেমিনারীতে থাকার পর ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে বেরিয়ে আসেন তিনি। পরে তিনি ২৬ বছর কাজ করেন উন্নয়ন সংস্থা আরডিআরএস বাংলাদেশে, এরপর যুক্ত হন ব্রিটিশ সরকারের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ডিএফআইডিতে যোগাযোগ ব্যবস্থাপক হিসেবে। এর পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন গির্জাভিত্তিক আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্বের ভূমিকাও পালন করেছেন। তিনি গর্বের সঙ্গে স্মরণ করেন সেমিনারীর আরও কয়েকজন কৃতী প্রাক্তন ছাত্রের কথা, যাদের মধ্যে আছেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের প্রথম দেশীয় আর্চবিশপ আমল গাঙ্গুলী, যাকে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে সাধু ঘোষণার প্রথম আনুষ্ঠানিক ধাপ হিসেবে "ঈশ্বরের সেবক" আখ্যা দেওয়া হয়; বর্তমান আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ; সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গোমেজ; এবং সাবেক রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী প্রমোদ মানকিন।

মিলন খান আরো বলেন, "প্রাক্তন সেমিনারিয়ানরা সমাজ ও অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, মণ্ডলীর প্রবৃদ্ধিতে অবদান রেখেছেন," মন্তব্য করেন খান। বান্দুরা সেমিনারী শুধু যাজক তৈরি করেনি, ভবিষ্যৎ নেতাও গড়ে তুলেছে।"

প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে নতুন পথে

থিওফিল নকরেক (৫৫)

পরিচালক, কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান নকরেক, জাতিগত পরিচয়ে একজন গারো। সেমিনারীতে ভর্তি হওয়ার আগে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময়েও পড়াশোনার পাশাপাশি বাবার সঙ্গে দিনমজুরের মতো কাজ করতে হতো তাকে। "সেমিনারীতে যাওয়ার আগে বাবার সঙ্গে দিনমজুরের মতো কাজ করতাম," স্মৃতিচারণ করেন তিনি। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে অষ্টম শ্রেণিতে ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীতে ভর্তি হওয়ার মধ্য দিয়ে তার জীবনের গতিপথ পুরোপুরি বদলে যায়।

ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর পাঠ শেষে তিনি যাজকীয় গঠনের পরবর্তী ধাপে বনানী মেজর সেমিনারীতে প্রবেশ হন। কিন্তু সেখানে পঞ্চম বর্ষে পড়ার সময় মেরুদণ্ডে গুরুতর আঘাত পান তিনি, এবং সেই অসুস্থতার কারণেই ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে তাকে যাজকীয় গঠন ছাড়তে বাধ্য হতে হয়। সেমিনারী ছাড়ার সময় রেক্টরের একটি কথা তার মনে গেঁথে আছে আজও। নকরেক বলেন "যাজক হতে পারলে না, তবে একজন ভালো কাথলিক হও, তিনি আমাকে বলেছিলেন। কথাটি আমি হৃদয়ে রেখে দিয়েছি।"

সেমিনারী ছাড়ার পর জীবন নতুন করে শুরু করতে হয় তাকে। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে কারিতাসে একজন জুনিয়র সুপারভাইজার হিসেবে যোগ দেন নকরেক, এবং এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ধাপে ধাপে উন্নতি করে বর্তমানে কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দিনমজুরের সন্তান থেকে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হয়ে ওঠার এই যাত্রায়, সেমিনারীতে কাটানো বছরগুলোকেই তিনি কৃতিত্ব দেন।

জীবনের ভিত্তি গড়ে দিয়েছে সেমিনারী

পিউস নানোয়ার

কারিতাস বাংলাদেশ

উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশের চা বাগান অঞ্চল শ্রীমঙ্গলের এক প্রান্তিক খাড়িয়া জনগোষ্ঠীর পরিবারে জন্ম নেন নানোয়ার। তার বাবা সেখানকার একটি চা বাগানে স্বল্প মজুরির শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। ছোটবেলায় হোস্টেলে থাকা সিনিয়র সেমিনারিয়ানদের শৃঙ্খলা, খেলাধুলা ও পড়াশোনায় দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন নানোয়ার, এবং সেই মুগ্ধতা থেকেই ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে চৌত্রিশ জনের একটি ব্যাচে ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীতে যোগ দেন তিনি।

২০০০ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত বান্দুরায় থাকার পর তিনি পরবর্তী ধাপের যাজকীয় গঠনের জন্য এগিয়ে যান, তবে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে এসে সম্পূর্ণভাবে সেই পথ ছেড়ে দেন। তিনি বলেন, সেমিনারীতে কাটানো সময়ই তার জীবনের ভিত গড়ে দিয়েছে। "সেমিনারী আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি গড়ে দিয়েছে। সেখানকার শৃঙ্খলা ও নৈতিক শিক্ষা আমার জীবনকে বদলে দিয়েছে," বলেন তিনি। প্রান্তিক এক চা শ্রমিক পরিবারের সন্তান থেকে একটি বড় মানবিক কর্মসূচির নেতৃত্বে পৌঁছানোর এই যাত্রাকে তিনি সেমিনারীর অবদানের একটি জীবন্ত উদাহরণ হিসেবেই দেখেন।

নতুন প্রজন্মের চোখে বদলে যাওয়া সেমিনারী

অ্যালেক্স স্টিফেন পিরিস (১৬)

বর্তমান সেমিনারিয়ান

তিনি বলেন, শত বছর আগের সেই কঠিন দিনগুলোর তুলনায় আজকের সেমিনারী অনেকটাই বদলে গেছে। এখন সেমিনারীতে জায়গার সংকুলান আগের চেয়ে অনেক বেশি, আছে দিনরাত বিদ্যুৎ সরবরাহ, পাইপলাইনে পানির ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎবিভ্রাটের সময় ব্যবহারের জন্য জেনারেটরও।

তবে সকাল পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত নির্ধারিত রুটিন, যা বান্দুরার হাজার হাজার সেমিনারীয়ান শত বছর ধরে অনুসরণ করে এসেছেন, তা আজও অপরিবর্তিত। "জীবন একটি ছন্দে চলে। এখানে সবকিছুর জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে," বলেন পিরিস।

নতুন রুটিনে মানিয়ে নেওয়ার গল্প

জেমস নাইজেল কোড়াইয়া

বর্তমান সেমিনারিয়ান (১৫)

শুরুতে সেমিনারীর বাঁধাধরা নিয়মকানুন তার কাছে বাইরের বন্ধুদের স্বাধীন জীবনের তুলনায় অনেকটা কঠোর মনে হতো। প্রতিদিনের নির্দিষ্ট সময়সূচি, প্রার্থনা, পড়াশোনা এবং নির্ধারিত কাজের চাপ শুরুর দিকে তাকে কিছুটা কষ্ট দিয়েছিল। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই রুটিনই এখন তার কাছে স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

শতবর্ষী এই সেমিনারীর প্রতিটি গল্পই যেন একটি সাধারণ সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে: ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী কখনোই কেবল যাজক তৈরির প্রতিষ্ঠান ছিল না। বিশপ থেকে যাজক, সমাজকর্মী থেকে শিক্ষাবিদ, মানবিক কর্মী থেকে সরকারি কর্মকর্তা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই প্রতিষ্ঠানের ছাপ স্পষ্ট। বিশপ গমেজের ভাষায় যে দুটি লক্ষ্য নিয়ে এই সেমিনারীর যাত্রা শুরু হয়েছিল, ফাদার রিবেরুর জীবনে যে নৈতিকতা ও শৃঙ্খলার শিক্ষা গেঁথে গিয়েছিল, খানের ভাষায় যে "ভবিষ্যৎ নেতা" গড়ে তোলার কথা উঠে এসেছে, নকরেক ও নানোয়ারের জীবনে প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে নতুন পথ খুঁজে পাওয়ার যে গল্প ফুটে উঠেছে, সব মিলিয়ে একটি বিষয়ই বারবার প্রতিফলিত হয়, এই প্রতিষ্ঠান মানুষ গড়ার একটি জীবন্ত কারখানা।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেমিনারীর বাহ্যিক রূপ বদলেছে। হ্যাজাক বাতির জায়গায় এসেছে দিনরাত বিদ্যুৎ, লাতিন ভাষার জায়গা নিয়েছে ব্যবসায় শিক্ষা, নদীতে গোসলের জায়গায় এসেছে পাইপলাইনের পানি। তবে যে মূল লক্ষ্য নিয়ে ফাদার ডেলোনী ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন, মানুষ গড়ার সেই লক্ষ্য আজও অটুট রয়েছে। প্রতিটি প্রজন্মের সেমিনারিয়ানরা নিজেদের সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই এগিয়ে গেছেন, আর অ্যালেক্স পিরিস কিংবা জেমস কোড়াইয়ার মতো আজকের সেমিনারিয়ানরাও একইভাবে প্রস্তুত হচ্ছেন আগামী দিনের জন্য।

আহ্বান কমে যাওয়ার মতো বাস্তব চ্যালেঞ্জ থাকলেও, পরিচালক ফাদার দেশাইয়ের ভাষায় সেমিনারীর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং আর্থিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে এই ধারা অব্যাহত রাখার আন্তরিক প্রচেষ্টা স্পষ্ট। এই মুহূর্তে, যখন খানের মতো প্রবীণ প্রাক্তন ছাত্ররা পরিবার নিয়ে ফিরে আসছেন আর তরুণ সেমিনারিয়ানরা নতুন স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, সবার প্রত্যাশা একটাই, আগামী শত বছরেও যেন এই প্রদীপ একইভাবে জ্বলতে থাকে, আর বান্দুরার এই ছোট্ট গঠন গৃহ বাংলাদেশের মণ্ডলী ও সমাজকে আলোকিত করতে থাকুক।

ঢাকাস্থ বোর্ণী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ক-২৯, সরকার বাড়ী (নীচতলা), নদ্দা, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

স্থাপিত : ০৫/০৮/১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, গভ. রেজি. নং : ০০৮৯৪/২০০৭

২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও মিলন মেলার পুনঃবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঢাকাস্থ বোর্ণী খ্রীষ্টান কো–অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্যদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৬ **নভেম্বর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ**, রোজ-শুক্রবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকায় অত্র সমিতির **"২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও মিলন মেলা"** ডি'মাজেনড গীর্জা প্রাঙ্গণে (প্রগতি স্বরণী,বারিধারা জে ব্লক, প্লট নং : ৫৮ এবং ৬০, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯) অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৮:০০ ঘটিকায় শুরু হবে এবং কোরাম পূর্তির জন্য আকর্ষণীয় লটারীর ব্যবস্থা আছে।

অতএব, উক্ত তারিখ ও সময়ে সভায় উপস্থিত থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য আপনি/আপনাদের বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে-

সুকুমার কোড়াইয়া
সভাপতি
ঢা. বো. খ্রী. কো-অপা. ক্রে. ইউ. লিঃ

সুজন পালমা
সম্পাদক
ঢা. বো. খ্রী. কো-অপা. ক্রে. ইউ. লিঃ

বিজ্ঞ/২০০/২৬

জপমালা: হৃদয়ের নীরব ভাষা মায়ের হাত ধরে যিশুর পথে

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা

জীবনে এমন সময় আসে, যখন আমাদের অনেক কথা থাকে, কিন্তু কাউকে বলার মতো ভাষা থাকে না। কখনো দুঃখে, কখনো অসুস্থতায়, কখনো পরিবারের সমস্যায়, আবার কখনো ভবিষ্যতের চিন্তায় আমরা নীরব হয়ে যাই। সেই সময় একটি জপমালা হাতে নেওয়া যায়। ধীরে ধীরে প্রার্থনা করি। আর আমাদের হৃদয় ঈশ্বরের দিকে ফিরে যায়। জপমালা শুধু একটি মালা নয়। এটি আমাদের হৃদয়ের নীরব ভাষা।

জপমালা কেন প্রার্থনা করি?: জপমালার মাধ্যমে আমরা মায়ের সঙ্গে যিশুর জীবনকে ধ্যান করি। যিশুর জন্ম, তার কাজ, তাঁর কষ্ট, তাঁর ক্রুশ, তাঁর মৃত্যু এবং তাঁর পুনরুত্থান। তাই জপমালার কেন্দ্র হলো যিশু খ্রিস্ট। মারীয়া আমাদের যিশুর কাছে নিয়ে যান। সাধু দ্বিতীয় জন পল তাঁর Rosarium Virginis Mariae পত্রে জপমালাকে খ্রিস্টের জীবন ধ্যান করার একটি সুন্দর পথ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। জপমালা তাই শুধু একই প্রার্থনার শব্দ বারবার বলা নয়। এটি যিশুর জীবনের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের একটি ধীর ও নীরব যাত্রা।

মারীয়া আমাদের কী শেখান?: ঈশ্বর যখন মারীয়াকে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন, তখন মারীয়া সবকিছু বুঝতে পারেননি। তবুও তিনি বললেন,"আমি প্রভুর দাসী; আপনার বাক্য অনুসারে আমার গতি হোক (লূক ১:৩৮)।" এটি ছিল বিশ্বাসের কথা। আমাদের জীবনেও অনেক কিছু আমরা বুঝতে পারি না। কেন আমি অসুস্থ? কেন আমার পরিবারে সমস্যা? কেন আমার প্রার্থনার উত্তর আসছে না? কেন আমার জীবন এত কঠিন? জপমালা সব প্রশ্নের উত্তর সঙ্গে সঙ্গে দেয় না। কিন্তু এটি আমাদের শেখায়: সবকিছু বুঝতে না পারলেও ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখা যায়। মা আমাদের শেখান–ঈশ্বরের পরিকল্পনা সবসময় আমাদের কাছে পরিষ্কার না হলেও তাঁর ওপর ভরসা করা যায়।

দুঃখের সময় জপমালা: দুঃখের সময় জপমালা আমাদের বিশেষভাবে শক্তি দিতে পারে। একজন মা অসুস্থ সন্তানের জন্য জপমালা বলেন। একজন বাবা পরিবারের জন্য প্রার্থনা করেন। একজন যুবক ভবিষ্যতের চিন্তায় জপমালা হাতে নেন। একজন বৃদ্ধ একাকী ঘরে বসে প্রার্থনা করেন। কোনো পরিবার প্রিয়জনকে হারিয়ে জপমালা বলে। জপমালা তাদের দুঃখকে জাদুর মতো দূর করে না। কিন্তু এটি মনে করিয়ে দেয়: "আমি একা নই। ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছেন।" ক্রুশের নিচে মারীয়া যিশুর পাশে ছিলেন। তিনি যিশুর কষ্ট দূর করতে পারেননি। কিন্তু তিনি পাশে ছিলেন। আমাদের জীবনেও এটি বড় শিক্ষা: সব কষ্ট দূর করা সম্ভব নয়; কিন্তু কষ্টের সময় একজন মানুষের পাশে থাকা সম্ভব।

বাংলাদেশের মানুষের জীবনে জপমালা: আমি পালকীয় কাজ করতে গিয়ে মানুষের জীবনের অনেক গল্পের কাছাকাছি আসার সুযোগ হয়েছে। কোনো পরিবার অর্থনৈতিক সমস্যায় আছে। কোনো মা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। কেউ অসুস্থ। কেউ একাকী। কেউ প্রিয়জন হারিয়েছেন। কেউ চাকরি খুঁজছেন। কেউ জীবনের কঠিন সময় পার করছেন। সব সমস্যার সমাধান আমাদের হাতে থাকে না। কিন্তু আমরা একটি কাজ করতে পারি–পাশে থাকতে পারি। কখনো অসুস্থ মানুষের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করা। কখনো তার কথা মন দিয়ে শোনা। কখনো পরিবারের সঙ্গে জপমালা বলা। কখনো শুধু বলা, "আমি আপনার জন্য প্রার্থনা করছি।"এই ছোট কথাটিও একজন মানুষের হৃদয়ে বড় আশা জাগাতে পারে। কখনো একটি জপমালার প্রতিটি পুঁতি একজন মানুষের জন্য প্রার্থনা হয়ে উঠতে পারে। তখন জপমালা শুধু ব্যক্তিগত devotion থাকে না; এটি হয়ে ওঠে ভালোবাসা ও সহযাত্রার একটি পথ।

পরিবারে জপমালা: আজ অনেক পরিবার একই বাড়িতে থাকে, কিন্তু একসঙ্গে সময় কাটায় না। মোবাইল, টেলিভিশন, কাজ, পড়াশোনা–সবকিছু আমাদের ব্যস্ত রাখে। জপমালা পরিবারকে কিছু সময়ের জন্য একসঙ্গে বসতে শেখাতে পারে। বাবা, মা ও সন্তান। সবাই একসঙ্গে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়ায়। তখন পরিবার শুধু একসঙ্গে প্রার্থনা করে না। তারা একে অন্যকে বলে: "তুমি আমার প্রার্থনার অংশ।" একটি পরিবার একসঙ্গে প্রার্থনা করলে তাদের মধ্যে ভালোবাসা, ক্ষমা ও ঐক্য আরও গভীর হতে পারে। একটি জপমালার প্রতিটি পুঁতি যেন পরিবারের একজন সদস্যের জন্য একটি ছোট প্রার্থনা হয়ে উঠতে পারে।

যুবকদের জন্য জপমালা: আজকের যুবকদের জীবন অনেক ব্যস্ত। তাদের হাতে smartphone আছে। Social media আছে। অনেক information আছে। কিন্তু অনেকের মনে শান্তি নেই। অনেক connection আছে, কিন্তু গভীর সম্পর্কের অভাব আছে। অনেক শব্দ আছে, কিন্তু নীরবতা কম। জপমালা যুবকদের একটু থামতে শেখায়। মোবাইল থেকে কিছুক্ষণ দূরে। শব্দ থেকে নীরবতায়। চিন্তা থেকে প্রার্থনায়। জপমালা যেন বলে: "একটু থামো। ঈশ্বর তোমাকে ভালোবাসেন।"একটি একটি পুঁতি হাতে নেওয়া যেন নিজের হৃদয়কে কিছুক্ষণের জন্য শান্ত হতে দেওয়া।

জপমালা শুধু মুখের প্রার্থনা নয়: আমরা অনেক জপমালা বলতে পারি। কিন্তু যদি আমাদের হৃদয় না বদলায়, তাহলে আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে। আমি কি ক্ষমা করতে শিখছি? আমি কি অন্যের কষ্ট বুঝতে শিখছি? আমি কি দরিদ্র মানুষের প্রতি ভালোবাসা দেখাচ্ছি? আমি কি পরিবারের মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছি? আমি কি ঈশ্বরের ওপর বেশি বিশ্বাস করছি? জপমালার আসল ফল শুধু মুখে নয়–জীবনে দেখা উচিত। আমরা জপমালা প্রার্থনার মাধ্যমে আরও ভালো মানুষ হতে পারি। যদি জপমালা প্রার্থনার পর আমি একজন অসুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াই, একজন দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করি, কাউকে ক্ষমা করি, অথবা একজন হতাশ মানুষকে আশা দিই–তাহলে আমার প্রার্থনা জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

জপমালা আমাদের কী শেখায়?

১. বিশ্বাস; সবকিছু না বুঝেও ঈশ্বরের ওপর ভরসা করা।

২. ধৈর্য; সব পরিবর্তন একদিনে আসে না। একটি একটি পুঁতি ধরে যেমন জপমালা বলা হয়, তেমনি জীবনও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়।

৩. নীরবতা; কিছু সময় চুপ থেকে ঈশ্বরের কথা শোনা।

৪. ভালোবাসা; অন্যের জন্য প্রার্থনা করা এবং তার কষ্টকে নিজের হৃদয়ে জায়গা দেওয়া।

৫. ক্ষমা; যে আমাদের কষ্ট দিয়েছে, তার জন্যও প্রার্থনা করা।

৬. আশা; কষ্টের পরেও বিশ্বাস করা যে ঈশ্বর আমাদের ছেড়ে যাননি।

একটি জপমালা, অনেক মানুষের জন্য প্রার্থনা: জপমালার প্রতিটি পুঁতি আমরা একজন মানুষের জন্য উৎসর্গ করতে পারি।

একটি পুঁতি–আমার পরিবারের জন্য।

একটি পুঁতি–অসুস্থ মানুষের জন্য।

একটি পুঁতি–দরিদ্র মানুষের জন্য।

একটি পুঁতি–একজন যুবকের জন্য।

একটি পুঁতি–একজন একাকী মানুষের জন্য।

একটি পুঁতি–যে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার জন্য।

একটি পুঁতি–আমার নিজের জীবনের জন্য।

একটি পুঁতি–শান্তির জন্য।

একটি পুঁতি–যারা যুদ্ধ ও সহিংসতার মধ্যে বাস করছে তাদের জন্য।

তখন আমাদের প্রার্থনা শুধু নিজের জন্য থাকে না। আমাদের হৃদয়ে অন্য মানুষের জন্যও জায়গা তৈরি হয়।

যখন কথা হারিয়ে যায়: জীবনে এমন দুঃখ আছে, যা কথায় বলা যায় না। একজন মায়ের কান্না। একজন বাবার চিন্তা। একজন অসুস্থ মানুষের কষ্ট। একজন যুবকের ভবিষ্যতের ভয়। একজন বৃদ্ধের একাকিত্ব। সেই সময় আমরা হয়তো জানি না কী বলব। তখন একটি জপমালা হাতে নিতে পারি। ধীরে বলি: "হে মা মারীয়া..." আবার বলি। একটি পুঁতি। আরেকটি পুঁতি। প্রার্থনা চলতে থাকে। সমস্যা হয়তো সঙ্গে সঙ্গে বদলায় না। কিন্তু আমাদের হৃদয় বদলাতে শুরু করে। ভয় একটু কমে। আশা একটু বাড়ে। বিশ্বাস আরও গভীর হয়। চোখে জল থাকলেও মনে হতে পারে–ঈশ্বর আমার কান্না দেখছেন।

জপমালা ও অসুস্থ মানুষের পাশে থাকা: একজন অসুস্থ মানুষের পাশে বসে জপমালা প্রার্থনা করা একটি গভীর পালকীয় অভিজ্ঞতা হতে পারে। হয়তো তিনি বেশি কথা বলতে পারছেন না। হয়তো তাঁর পরিবার উদ্বিগ্ন। হয়তো চিকিৎসার ফল নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে। সেই মুহূর্তে আমরা সব উত্তর দিতে পারি না। কিন্তু আমরা বলতে পারি: "চলুন, আমরা একসঙ্গে প্রার্থনা করি।" একটি একটি পুঁতি ধরে প্রার্থনা করতে করতে মানুষ অনুভব করতে পারেন যে তাঁর কষ্ট কেউ শুনছে। এখানে জপমালা শুধু devotion নয়। এটি হয়ে ওঠে presence–একজন মানুষের পাশে থাকার ভাষা।

জপমালা এবং শান্তি: জপমালা শুধু ব্যক্তিগত শান্তির জন্য নয়; এটি আমাদের অন্যের সঙ্গে শান্তিতে বাঁচতেও শেখাতে পারে। যে ব্যক্তি প্রার্থনায় ক্ষমা করতে শেখেন, তিনি অন্যকে ক্ষমা করতে পারেন। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের করুণা অনুভব করেন, তিনি অন্যের প্রতি করুণাময় হতে পারেন। যে ব্যক্তি মা মারীয়ার বিনয় ধ্যান করেন, তিনি অন্যকে ছোট করতে শেখেন না। যে ব্যক্তি যিশুর ক্রুশ ধ্যান করেন, তিনি ত্যাগ ও ভালোবাসার মূল্য বুঝতে পারেন। তাই জপমালা আমাদের শুধু প্রার্থনার মানুষ নয়, শান্তির মানুষ হতে আহ্বান করে।

জপমালা এবং চারটি রহস্য: জপমালার চারটি রহস্য আমাদের যিশুর জীবনের বিভিন্ন দিক ধ্যান করতে সাহায্য করে।

আনন্দের রহস্য: যিশুর জন্ম ও শৈশবের আনন্দ আমাদের শেখায়–ঈশ্বর আমাদের সাধারণ জীবনের মধ্যেও উপস্থিত।

আলোর রহস্য: যিশুর প্রকাশ্য জীবন ও তাঁর সুসমাচারের কাজ আমাদের শেখায়–আমাদের জীবনেও সত্যের আলো জ্বলতে হবে।

শোকময় রহস্য: যিশুর কষ্ট ও ক্রুশ আমাদের শেখায়–কষ্টের মধ্যেও ভালোবাসা ও বিশ্বাস ধরে রাখা যায়।

গৌরবময় রহস্য: পুনরুত্থান ও মহিমা আমাদের শেখায়–কষ্ট ও মৃত্যুই শেষ কথা নয়। আশাই শেষ কথা। এই চারটি রহস্য আমাদের জীবনের সঙ্গেও মিলে যায়: আনন্দ, আলো, কষ্ট এবং আশা।

মারীয়া আমাদের যিশুর কাছে নিয়ে যান: জপমালা বলতে বলতে আমরা মায়ের সঙ্গে হাঁটি। কিন্তু মা আমাদের নিজের কাছে আটকে রাখেন না। তিনি আমাদের যিশুর দিকে নিয়ে যান। কানা নগরে বিবাহের সময় মারীয়া বলেছিলেন: "তিনি তোমাদের যা বলেন, তাই করো (যোহন ২:৫)।" এই কথাটিই যেন জপমালার একটি সুন্দর সারাংশ। মারীয়া আমাদের বলেন: যিশুর কথা শোনো। যিশুর পথে চলো। যিশুর মতো ভালোবাসো।

তাই জপমালার শেষ লক্ষ্য শুধু বেশি প্রার্থনা করা নয়। শেষ লক্ষ্য হলো আরও বেশি খ্রিস্টের মতো হয়ে ওঠা।

শেষ কথা: জপমালা আমাদের শুধু প্রার্থনা করতে শেখায় না। এটি আমাদের শেখায়–বিশ্বাস করতে। ভালোবাসতে। ক্ষমা করতে। অন্যের পাশে থাকতে। আশা রাখতে। মারীয়া আমাদের যিশুর কাছে নিয়ে যান। যিশু আমাদের মানুষের কাছে পাঠান। তাই জপমালা প্রার্থনায় যদি আমরা একজন দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াই, একজন অসুস্থ মানুষের কথা শুনি, একজন দরিদ্রকে সাহায্য করি, অথবা কাউকে ক্ষমা করি–তাহলে আমাদের জপমালা সত্যিই জীবন্ত হয়ে ওঠে। হয়তো একদিন কোনো মানুষ আমাদের কথা মনে করে বলবে, "ঈশ্বর আমার কষ্ট সঙ্গে সঙ্গে দূর করেননি; কিন্তু তিনি একজন মানুষকে আমার পাশে পাঠিয়েছিলেন।" সেই মানুষটি আমরা হতে পারি। তাই– জপমালা হাতে নিই। মায়ের সঙ্গে যিশুর পথে হাঁটি। আর আমাদের জীবনকে করি ভালোবাসা, প্রার্থনা ও আশার সাক্ষ্য।

তথ্যসূত্র

১. পবিত্র বাইবেল – লূক ১:২৬-৩৮; যোহন ২:১-১২; যোহন ১৯:২৫-২৭; প্রেরিত ১:১৪।

২. Catechism of the Catholic Church, §§971, 2673–2679.

৩. St. John Paul II, Rosarium Virginis Mariae, Apostolic Letter on the Most Holy Rosary, 16 October 2002.

৪. St. Paul VI, Marialis Cultus, Apostolic Exhortation for the Right Ordering and Development of Devotion to the Blessed Virgin Mary, 2 February 1974.

৫. Second Vatican Council, Lumen Gentium, Chapter VIII Ñ The Blessed Virgin Mary, Mother of God, in the Mystery of Christ and the Church.

৬. Pope Francis, Evangelii Gaudium, Apostolic Exhortation, 24 November 2013.

(১৩ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

যাবে। কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তোলা একটি ছবি, বন্ধুর সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা, শিক্ষকের স্মরণ এবং পুরোনো দিনের গল্পগুলো হয়ে থাকবে ভবিষ্যতের স্মৃতি।

সময়ের নিয়মে পুরোনোকে বিদায় দিয়ে নতুনকে স্বাগত জানাতেই হয়। উন্নয়ন প্রয়োজন, আধুনিক শিক্ষা অবকাঠামোও প্রয়োজন। কিন্তু উন্নয়নের পাশাপাশি ঐতিহ্য ও স্মৃতির মূল্যও মনে রাখা জরুরি। কারণ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধু তার ভবন দিয়ে পরিচিত হয় না; তার পরিচয় গড়ে ওঠে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষা, মূল্যবোধ এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তৈরি হওয়া সম্পর্কের মাধ্যমে।

তাই, হ্যারিংটন ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে হয়তো অনেক সাবেক নটরডেমিয়ান নীরবে বলবেন -

"বিদায়, প্রিয় পুরোনো ঘর, ফাদার হ্যারিংটন ভবন।

তোমার দেয়াল হয়তো থাকবে না,

কিন্তু তোমার ভেতরে গড়ে ওঠা আমাদের গল্পগুলো থাকবে।

তোমার করিডোরে আমাদের পদচিহ্ন মুছে যাবে,

কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব মুছে যাবে না।

তোমার মাঠে হয়তো নতুন প্রজন্ম খেলবে,

কিন্তু আমাদের হাসির প্রতিধ্বনি থেকে যাবে স্মৃতির পাতায়।"

বছরের পর বছর ধরে এই ভবনটি ইট-পাথরের কাঠামোর চেয়েও অনেক বেশি কিছু হয়ে উঠেছিল। এর ক্লাসরুম, বারান্দা আর চারপাশ জুড়ে সাক্ষী হয়ে আছে অগণিত নটরডেমিয়ানের আশা, স্বপ্ন, বন্ধুত্ব আর তারুণ্যের অম্লান স্মৃতি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শিক্ষার্থীদের কাছে হ্যারিংটন ভবনটি আমাদের কলেজ জীবনের এক চেনা ও ভালোবাসার অংশ হয়ে উঠেছিল; যেখানে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, স্বপ্ন রূপ পেয়েছিল আর জমা হয়েছিল অজস্র মূল্যবান স্মৃতি। একটি ভবন বিদায় নিতে পারে। একটি যুগেরও সমাপ্তি ঘটতে পারে। কিন্তু বন্ধুত্বের নয়! স্মৃতির নয়! নটর ডেম কলেজের ফাদার হ্যারিংটন ভবনকে ঘিরে যে স্মৃতি, ভালোবাসা ও নস্টালজিয়া তৈরি হয়েছে তা কখনোই মুছে যাবে না।

হ্যারিংটন ভবন: আমাদের স্মৃতিতে এক জীবন্ত উত্তরাধিকার

নিকোলাস বিশ্বাস

কিছু ভবন শুধু ইট, বালি, সিমেন্ট আর কংক্রিট দিয়ে তৈরি হয় না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেসব ভবনের দেয়াল, সিঁড়ি, করিডোর আর জানালায় জমে থাকে মানুষের হাসি-কান্না, স্বপ্ন, বন্ধুত্ব ও জীবনের অসংখ্য গল্প। নটর ডেম কলেজের ঐতিহ্যবাহী ফাদার হ্যারিংটন ভবন তেমনই একটি ভবন - যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম নটরডেমিয়ানদের কৈশোর, তারুণ্য ও জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

নটর ডেম কলেজ ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ফাদার জন হ্যারিংটন সিএসসি এর দূরদর্শী নেতৃত্বে এক গৌরবময় যাত্রা শুরু করে। তিনি ছিলেন নটর ডেম কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই নবীন প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচালনা করেন এবং এমন একটি শিক্ষাগত ঐতিহ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন, যা পরবর্তীতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করেছে। কার্ডিনাল ভ্যালেরিয়ান গ্রাসিয়াস ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এটিই ছিল ১ম কলেজ ভবন। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর এই ভবনটিকে ফাদার জন হ্যারিংটন সিএসসি'র সম্মানে তাঁর নামে নামকরণ করা হয়।

বৃহত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নটর ডেম কলেজের পুরনো ও মূল হ্যারিংটন ভবনটি ভেঙে একই স্থানে একটি নতুন আধুনিক ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঘোষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী, ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে পুরনো ভবনটি ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হওয়ার কথা। ফলে বহু সাবেক শিক্ষার্থীর কাছে এটি যেন একটি যুগের অবসানের মুহূর্ত।

ভবনটি হয়তো আর থাকবে না। কিন্তু যে স্মৃতিগুলো সেখানে তৈরি হয়েছে, সেগুলো কি কখনো ভাঙা যায়? একজন নটরডেমিয়ান যখন পুরনো কলেজ ভবনের ছবি দেখেন, তখন হয়তো তাঁর চোখে শুধু একটি স্থাপনা ধরা পড়ে না। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই পরিচিত করিডোর, ক্লাসরুম, সিঁড়ি, ল্যাবরেটরি, মাঠ এবং বন্ধুদের মুখ। মনে পড়ে ক্লাস ফাঁকি, পরীক্ষার প্রস্তুতি, শিক্ষকদের শাসন, বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা, খেলাধুলা আর জীবনের প্রথম বড় স্বপ্নগুলোর কথা।

গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ প্রিয় কলেজ ভবন পরিদর্শন উপলক্ষে NDC'89 Batch -এর একটি ফটোকার্ডে লেখা হয়েছে "Once Classmates, Forever Family." মাত্র চারটি শব্দের এই বাক্য যেন নটরডেমিয়ানদের বন্ধন ও সম্পর্কের গভীরতাকে অসাধারণভাবে প্রকাশ করে। আমিও নটর ডেম কলেজের ১৯৮৯ ব্যাচের একজন গর্বিত ছাত্র।

সময় আমাদের ছড়িয়ে দিয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, এমনকি বিশ্বের নানা দেশে। কেউ শিক্ষক, কেউ চিকিৎসক, কেউ প্রকৌশলী, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ প্রশাসক, কেউ রাজনীতিবিদ - আবার কেউ নিজ নিজ পেশায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পেশা, দূরত্ব কিংবা বয়সের ব্যবধান আমাদের সেই পুরোনো বন্ধনকে কখনো মুছে দিতে পারেনি। নটরডেম কলেজের স্মৃতিই যেন আমাদের একই সুতোয় বেঁধে রেখেছে।

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সকালে আমরা সদলবলে ফিরে গিয়েছিলাম আমাদের প্রিয় কলেজ প্রাঙ্গণে। ফিরে গিয়েছিলাম সেই চিরচেনা অথচ বহুদিনের অচেনা হয়ে যাওয়া জায়গাগুলোর কাছে যেখানে একসময় আমাদের কৈশোর ও তারুণ্যের সবচেয়ে সুন্দর দিনগুলো কেটেছে।

ঘুরে ঘুরে দেখব আমাদের প্রিয় শ্রেণিকক্ষ। দেখব সেই কলেজের বারান্দা, যেখানে টিফিনের সময় আমরা বন্ধুরা হৈহুল্লোড়, হাসি-আনন্দ আর গল্পে মেতে উঠতাম। হয়তো বারান্দার কোনো একটি কোণে দাঁড়ালে আজও কানে ভেসে আসবে সহপাঠীদের সেই প্রাণবন্ত কণ্ঠস্বর। মনে হবে, সময় বুঝি থমকে গেছে; আমরা আবার ফিরে গেছি সেই সোনালি দিনগুলোর কাছে। নটর ডেম আমাদের জন্য একটি অনন্য তীর্থভূমি যেখানে মন-পাগল বারবার ফিরে আসতে চায়।

দেখব আমাদের প্রিয় কলেজ মাঠ, বিশেষ করে লতানো গাছে ঘেরা সেই ভলিবল মাঠটি। দেখব কলেজের সামনের বাহারি গাছপালা ও ফুলের বাগান। প্রতিটি গাছ, প্রতিটি পথ, প্রতিটি বারান্দা, প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ যেন আমাদের জীবনের এক একটি অধ্যায়ের নীরব সাক্ষী।

তাই ২৬ সেপ্টেম্বরের এই ফিরে যাওয়া শুধু একটি কলেজ পরিদর্শন নয়। এটি আমাদের শিকড়ের কাছে ফিরে যাওয়া, স্মৃতির কাছে ফিরে যাওয়া, বন্ধুত্বের কাছে ফিরে যাওয়া এবং আমাদের জীবনের সেই অমূল্য সময়টির কাছে ফিরে যাওয়া, যে সময় আর কখনো ফিরে আসবে না।

নটরডেম কলেজ আমাদের শুধু শিক্ষা দেয়নি; দিয়েছে বন্ধুত্ব, মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা, মানবিকতা এবং আজীবন বহন করার মতো অসংখ্য স্মৃতি। তাই পুরনো ভবনের দেয়ালগুলো যখন আমাদের অতীতের গল্প বলে, তখন সেগুলো কেবল ইট-পাথরের দেয়াল থাকে না - সেগুলো হয়ে ওঠে আমাদের জীবনেরই অংশ।

কলেজ কর্তৃপক্ষও সাবেক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন - পুরোনো ক্লাসরুম, সিঁড়ি ও প্রাঙ্গণের সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করতে, স্মৃতিগুলোকে হৃদয়ে ধারণ করতে এবং সম্ভব হলে ছবিতে ফ্রেমবন্দি করে রাখতে। এই আহ্বান যেন বহু বছরের স্মৃতির দরজা আবার খুলে দিয়েছে। সাবেকদের কেউ লিখেছেন, "অনেক মিস করব কলেজে গেলে।" আরেকজনের কণ্ঠে উঠে এসেছে আরও নির্দিষ্ট স্মৃতি: "ল্যাবগুলো খুব মিস করব।"

কারও কাছে আবার ফিজিক্স ল্যাব মানেই বিশেষ এক স্মৃতি। জিয়া মাহমুদ তমালের কথায় উঠে এসেছে: সুশান্ত সরকার স্যারের কাছে শাস্তি পাওয়ার সেই পুরনো ঘটনা। আজ বহু বছর পর সেই কঠিন মুহূর্তও যেন মধুর স্মৃতি হয়ে ফিরে আসে। সাবেক এই নটরডেমিয়ান লিখেছেন: কলেজ জীবনের "হাজারো স্মৃতি" ভোলা সম্ভব নয়।

এটাও নটরডেম-এর আসল শক্তি। শুধু শিক্ষা নয়, স্মৃতিও সৃষ্টি করা। এই বিদ্যাপীঠের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ফাদার হ্যারিংটন, ফাদার টিম, ফাদার পিশাতো, ফাদার গিলেস্পি, ফাদার বেঞ্জামিন, ফাদার বকুল, ফাদার বেনেডিক্ট, ফাদার হেমন্ত সহ টেরেন্স স্যার, জ্যোতি স্যার, মানিক স্যার, মিত্র স্যার, আজহার স্যার, তমাল স্যার, অমর স্যার, মহিউদ্দিন স্যার, রেজাউদ্দিন স্যার, আজমল স্যার, সুশান্ত স্যার, প্রিয় হামিদ স্যার, গরীব নেওয়াজ স্যার ও প্রমিলা ম্যাডাম, মারলিন ম্যাডামসহ অসংখ্য শিক্ষক ও কর্মীর স্মৃতি। তাঁদের শাসন, স্নেহ, শিক্ষা ও মূল্যবোধ সাবেক শিক্ষার্থীদের জীবনে যে ছাপ রেখে গেছে, সেটিই আজ নটরডেমিয়ানদের স্মৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

প্রিয় ২১২ নম্বর ক্লাসরুমের কথা বলতে গিয়ে একজন সাবেক শিক্ষার্থী লিখেছেন: "স্মৃতি রোমন্থনের ফাঁদে মায়া বড় বিভ্রান্তকর বস্তু ... নশ্বর এই পৃথিবীতে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়।"

কথাটি সত্যিই গভীর। পৃথিবীতে কোনো স্থাপনাই চিরস্থায়ী নয়। পুরোনো ভবন একদিন নতুন ভবনের জায়গা করে নেয়। একটি প্রজন্মের পরিচিত দৃশ্য আরেক প্রজন্মের কাছে ইতিহাস হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের জীবনে যে অনুভূতি, সম্পর্ক ও মূল্যবোধ তৈরি হয়, তার স্থায়িত্ব অনেক বেশি।

হ্যারিংটন ভবনের বিদায় তাই শুধুই একটি ভবন ভেঙে ফেলার ঘটনা নয়। এটি এক প্রজন্মের কাছে নিজেদের ফেলে আসা সময়কে আরেকবার ফিরে দেখার সুযোগ। পুরনো বেঞ্চ, দেয়াল, সিঁড়ি, ল্যাবরেটরি কিংবা সুপরিসর খেলার মাঠ - সবকিছু হয়তো একদিন হারিয়ে

(বাকি অংশ ১৩ পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

ঢাকাস্থ মঠবাড়ী খ্রিস্টান কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিমিটেড

সূত্র: ঢামখ্রিকসসলি/সেক্রেটারি/২০২৬-২০২৭/০০১৮ তারিখ: ৩১ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ঢাকাস্থ মঠবাড়ী খ্রিস্টান কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন-২০২৬ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সম্মানিত সুধী,

ঢাকাস্থ মঠবাড়ী খ্রিস্টান কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর পক্ষ হতে সমবায়ী শুভেচ্ছা নিবেন। সমিতির সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, সমিতির বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিষদের ২য় মাসিক সভার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ১৪ নভেম্বর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শনিবার, সময়: সকাল: ৮:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে স্থান: সমিতির অফিস (চার্চ কমিউনিটি সেন্টার (৩য় তলা), ৯ তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫) অত্র সমিতির বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন-২০২৬ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় সমবায় সমিতি আইন-২০০১ (সংশোধিত-২০০২ ও ২০১৩), সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ (সংশোধিত-২০২০) এবং সমিতির উপ-আইন অনুসারে ব্যবস্থাপনা কমিটির ১ (এক) জন চেয়ারম্যান, ১ (এক) জন ভাইস-চেয়ারম্যান, ১ (এক) জন সেক্রেটারি, ১ (এক) জন ট্রেজারার এবং ৮ (আট) জন বোর্ড অব ডিরেক্টর সমিতির সদস্য-সদস্যাদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

নির্বাচন-২০২৬ পরিচালনার জন্য গঠিত নির্বাচন কমিটি কর্তৃক নির্বাচনী তফসিলসহ যাবতীয় তথ্যাদি যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্যে প্রকাশ করা হবে।

অতএব, উক্ত বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন-২০২৬ আপনারা যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সভাকে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

আলোচ্যসূচী: সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন-২০২৬।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

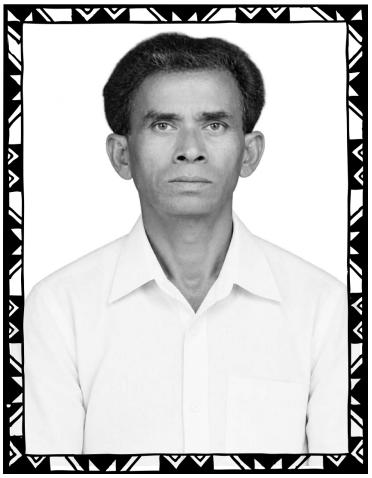
মি. রবি বার্ণার্ড জেড. রোজারিও
চেয়ারম্যান
ঢাকাস্থ মঠবাড়ী খ্রিস্টান কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিমিটেড

মি. লেনার্ড যোসেফ পিউরীফিকেশন
সেক্রেটারি
ঢাকাস্থ মঠবাড়ী খ্রিস্টান কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিমিটেড

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রদান করা হলো:

১) জেলা সমবায় অফিসার, তেজগাঁও, ঢাকা জেলা। ২) মেট্রোপলিটন থানা সমবায় অফিসার, তেজগাঁও, ঢাকা। ৩) চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা কমিটি, মঠবাড়ী খ্রিস্টান কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিমিটেড। ৪) অফিস কপি, সমিতির নোটিশ বোর্ড, ঢাকাস্থ মঠবাড়ী খ্রিস্টান কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিমিটেড।

বিজ্ঞ/১৯৯/২৬



নাম: জন ভিনসেন্ট গমেজ
জন্ম: ০৭-১১-১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৭-১০-২০০৬ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: উত্তর-পানজোরা
নাগরী, গাজীপুর।

স্বর্গরাজ্যে বাবার বিশতম জন্মবার্ষিকী

তুমি ছিলে, আছো এবং থাকবে
মোদের হৃদয় মাঝারে।

এ বিশ্ব জগত সংসারে তোমার উপস্থিতিতে আমরা ছিলাম শান্তিতে, স্বস্তিতে ও স্নেহাশ্রয়ে। সময়ের আবর্তে শত কর্মব্যস্ততায় কেটে গেছে বেশ কয়েকটা বছর। বাবা, যেদিন আমাদের কাঁদিয়ে সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেলে পরম পিতার কোলে। তোমাকে ছাড়া আমাদের ঘর শূণ্য, তোমার স্পর্শ আজও পরিবারে জড়িয়ে আছে। তুমি বেঁচে আছো আমাদের হৃদয় মাঝারে। তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ, তোমার অপরিসীম ভালবাসাকে সম্বল করে আমরা বেঁচে আছি।

আশীর্বাদ করো বাবা, আমরা যেন তোমার আদর্শকে অনুসরণ করে সকল কাজে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারি। পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করেন।

পরিবারের পক্ষে–

স্ত্রী - শেফালী রড্রিক্স
মেয়ে - শান্তি, চন্দ্রা ও সি. মেরী ষ্টেল্লা এসএমআরএ
ছেলে ও ছেলে বউ - শংকর ও অনিমা গমেজ
নাতি - স্নিগ্ধ ও স্পর্শ গমেজ

বিজ্ঞ/২০১/২৬

বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

নদী ও বাংলাদেশ যেন এক অবিচ্ছেদ্য সত্তা। এ দেশের মানুষের জীবন, সংস্কৃতি ও বিনোদনের সঙ্গে নদী মিশে আছে গভীরভাবে। বর্ষাকালে খাল-বিল ও নদী-নালা যখন পানিতে কানায় কানায় ভরে ওঠে, তখন গ্রামীণ জনপদে উৎসবের আমেজ নিয়ে হাজির হয় ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ। এটি কেবল নৌকা চালানোর প্রতিযোগিতা নয়; বরং বাংলার মানুষের মিলন, আনন্দ, ঐক্য ও সামাজিক সম্প্রীতির এক অনন্য লোকউৎসব। সাধারণত বর্ষা ও শরৎকালে, অর্থাৎ জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে, বিভিন্ন নদ-নদীতে নৌকা বাইচের আয়োজন করা হয়। বিশেষত শ্রাবণ-ভাদ্রের ভরা নদী হয়ে ওঠে এই প্রতিযোগিতার প্রাণকেন্দ্র। সরু ও লম্বাটে বিশেষ নৌকায় দলবদ্ধ মাঝিরা এতে অংশ নেন। কোনো কোনো নৌকায় ৫০ থেকে ১০০ জন পর্যন্ত মাঝি একসঙ্গে বৈঠা চালান। 'বাইচ' শব্দটি ফারসি 'বাজি' থেকে এসেছে বলে প্রচলিত আছে, যার অর্থ খেলা বা প্রতিযোগিতা। মাঝিদের বৈঠার ছন্দ, সমস্বরে গাওয়া সারি গান এবং নদীর দুই তীরে মানুষের উচ্ছ্বাস মিলিয়ে সৃষ্টি হয় এক প্রাণবন্ত উৎসবের আবহ। নদীর ঢেউ ও বৈঠার তালে যেন জেগে ওঠে বাংলার চিরচেনা লোকজ জীবন। তাই নৌকা বাইচ আমাদের নদীমাতৃক সংস্কৃতির এক মূল্যবান ঐতিহ্য; এর মধ্যে প্রতিযোগিতার উত্তেজনার পাশাপাশি প্রকাশ পায় মানুষের মেলবন্ধন, আনন্দ ও সম্প্রীতির গভীর বন্ধন।

নৌকা বাইচের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। এর উৎপত্তি সম্পর্কে প্রচলিত ঐতিহাসিক মত হলো, মোগল ও নবাবী আমলে বাংলার নৌবাহিনীর যুদ্ধপ্রশিক্ষণ ও নৌমহড়া থেকেই এর সূচনা। বাংলার বারো ভূঁইয়া এবং স্থানীয় শাসকেরা দ্রুতগামী 'ছিপ' নৌকা ব্যবহার করে নৌযুদ্ধ ও জলদস্যু দমনে দক্ষতা অর্জন করতেন। সময়ের সঙ্গে সেই নৌমহড়া ও প্রতিযোগিতা সাধারণ মানুষের বিনোদনে রূপ নেয় এবং নৌকা বাইচ একটি জনপ্রিয় লোকউৎসবে পরিণত হয়। তবে এর সঙ্গে মনসা দেবী, শ্রীচৈতন্যদেব ও জগন্নাথদেবকে ঘিরে নানা লোককাহিনী ও জনশ্রুতিও প্রচলিত আছে। এসবের ঐতিহাসিক সত্যতা নিশ্চিত না হলেও বাংলার লোকসংস্কৃতিতে এগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ইতিহাস ও লোকবিশ্বাসের এই সম্মিলিত ধারাই নৌকা বাইচকে বাংলার নদী ও মানুষের জীবন সংস্কৃতির এক গভীর ঐতিহ্যে পরিণত করেছে।

নৌকা বাইচের জন্য সাধারণ নৌকা নয়, বিশেষভাবে তৈরি দীর্ঘ ও সরু নৌকা ব্যবহৃত হয়। ছিপ, ময়ূরপঙ্খী, খেল নাও, পঙ্খিরাজ ও ঝড়ের পাখির মতো নৌকা দক্ষ কারিগরেরা ঐতিহ্যবাহী কৌশলে তৈরি করেন। শাল, গর্জন ও চাম্বল কাঠ দিয়ে নির্মিত এসব নৌকার গতি বাড়াতে নিচের অংশ মসৃণ করে তেল বা প্রলেপ দেওয়া হয়। গলুইতে পিতলের চোখ, ময়ূরের মুখ ও নানা রঙের নকশায় সাজিয়ে নৌকাকে দেওয়া হয় বিশেষ রূপ। ফলে বাইচের নৌকা শুধু প্রতিযোগিতার বাহন নয়, বাংলার লোক কারুশিল্পেরও এক অনন্য নিদর্শন।

নৌকা তৈরি ও নদীতে ভাসানোর সঙ্গে নানা লোকাচার ও ধর্মীয় বিশ্বাসও জড়িয়ে আছে। কোথাও কাজ শুরুর আগে মিলাদ ও দোয়া, আবার কোথাও বিশ্বকর্মা পূজার আয়োজন করা হয়। নৌকা ভাসানোর সময় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সিঁদুর, স্বস্তিকা, মঙ্গলঘট, ধূপ-দীপ ও ফল-মিষ্টির মাধ্যমে মঙ্গল কামনা করেন; মুসলমানেরা আয়োজন করেন মিলাদ, দোয়া ও তবারক বিতরণের। 'নজর' থেকে রক্ষার জন্য কালো সুতো, তাবিজ বা বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহারের লোকবিশ্বাসও প্রচলিত ছিল।

নৌকা বাইচের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ও প্রাণশক্তি হলো সারি গান। এটি মূলত সমবেত শ্রমের গান, যা মাঝিদের ক্লান্তি দূর করার পাশাপাশি বৈঠার টান ও নৌকার গতির মধ্যে ছন্দ ও সমন্বয় সৃষ্টি করে। বাইচের সময় একজন প্রধান গায়ক বা নির্দেশক, যাঁকে অনেক এলাকায় 'সাইরদার' বলা হয়, গানের প্রথম চরণ ধরেন; পরে মাঝি-মাল্লারা সমস্বরে ধুয়া গেয়ে ওঠেন এবং গানের তালে একসঙ্গে বৈঠা চালান। ফলে গান ও বৈঠার ছন্দ একাকার হয়ে নৌকার গতি আরও তীব্র ও সুশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। মাঝিদের কণ্ঠে সারি গানের সুর, বৈঠার ছন্দ ও নদীর ঢেউ মিলিয়ে নৌকা বাইচের পরিবেশ হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত ও উদ্দীপনাময়।

বাইচের প্রস্তুতিতেও মাঝিদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রতিযোগিতার আগে তাঁরা সংযম পালন ও নিজ নিজ ধর্মমতে প্রার্থনা করতেন এবং নৌকায় ওঠার আগে সমস্বরে সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ করতেন। এসব আচার, বিশ্বাস ও সম্মিলিত প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে নৌকা বাইচ কেবল একটি প্রতিযোগিতা নয়; এটি বাংলার লোকজ সংস্কৃতি, ধর্মীয় সহাবস্থান, ঐক্য ও সামাজিক সম্প্রীতিরও এক জীবন্ত প্রকাশ।

বাইচে অংশ নেওয়া নৌকাগুলোর নামও হয় আকর্ষণীয় ও বাহারি–বিজয় নিশান, উড়ালপঙ্খি, নয়নের মণি, আলিশান এক্সপ্রেস, মার্টিন ভূঁইয়া, তুফান মেইল, সোনার তরী ইত্যাদি। প্রতিযোগিতার দিন নানা রঙ ও পতাকায় সাজানো এসব নৌকা যখন নদীর বুকে সারি বেঁধে নামে, তখন চারপাশে তৈরি হয় এক অপূর্ব উৎসবের আবহ। হালধর বা দলনেতার নির্দেশে মাঝিরা একই ছন্দে বৈঠা চালান; সব বৈঠা মিলেমিশে যায় এক ছন্দে, গানের তালে তালে নৌকা ছুটে চলে সামনের দিকে। বাইচ শুরু হলে নদীর দুই পাড়ে নামে হাজারো মানুষের ঢল। ঢাক-ঢোল ও বাজনার শব্দ, মাঝিদের সমস্বরে হাঁকডাক, সারি গানের সুর এবং জলের বুকে শত বৈঠার ছলাৎ ছলাৎ শব্দে মুখর হয়ে ওঠে চারপাশ। দর্শকদের হর্ষধ্বনি আর মাঝিদের প্রাণের উচ্ছ্বাসে নদী যেন মুহূর্তের জন্য হয়ে ওঠে বাংলার লোকজ জীবনের এক বিশাল উৎসবমঞ্চ। প্রতিযোগিতার উত্তেজনার সঙ্গে মিশে যায় মানুষের আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও মিলনের অনির্বচনীয় আবেশ।

আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব, নদীদূষণ ও নাব্যতা সংকটের কারণে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ আজ কিছুটা ম্লান হয়ে পড়লেও দেশের বিভিন্ন নদীতে এখনো এর প্রাণবন্ত আয়োজন আমাদের আশাবাদী করে। এটি কেবল একটি খেলা নয়; জাতি, ধর্ম ও বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে মানুষকে একত্রিত করার এক অনন্য উৎসব এবং সামাজিক সম্প্রীতির প্রতীক। যান্ত্রিক জীবনের ক্লান্তি দূর করে নৌকা বাইচ মানুষকে দেয় নির্মল আনন্দ ও মিলনের সুযোগ। নদীর ঢেউ, শত বৈঠার ছন্দ, মাঝিদের সম্মিলিত কণ্ঠ আর দর্শকদের উচ্ছ্বাসের মধ্যে যেন ধরা পড়ে বাংলার চিরচেনা প্রাণ। 'হেইও জোয়ান হেইও' ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয় আমাদের লোকঐতিহ্যের সেই পুরোনো সুর। নৌকা বাইচ তাই শুধু একটি প্রতিযোগিতা নয়; এটি গ্রামীণ বাংলার মানুষের আবেগ, ঐতিহ্য, বিশ্বাস, আনন্দ ও সম্প্রীতির এক জীবন্ত প্রকাশ। সময় বদলাবে, জীবনযাত্রা বদলাবে; তবু নদী ও নৌকার এই প্রাণের উৎসব বেঁচে থাকুক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বাংলার ঐতিহ্যের এক অমূল্য উত্তরাধিকার হয়ে।

তথ্যসূত্র

• রহমান, এস. এম. মাহফুজুর: "নৌকা বাইচ", বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।

• চট্টগ্রাম বিভাগ: "বিভাগের ঐতিহ্য–নৌকা বাইচ", চট্টগ্রাম বিভাগীয় সরকারি ওয়েবসাইট।

• আবদুস শহীদ: "কৈশোর সংস্কৃতি: নৌকা বাইচ", প্রথম আলো।

রক্তের ধর্ম নেই

ক্ষুদীরাম দাস

গ্রামের নাম ছিলো সবুজগ্রাম। নামটাই যেন বলে দিতো, এখানে সবকিছু সবুজ। ধানের ক্ষেত, আমবাগান, পুকুরের চারপাশে শালুক-শাপলা, আর মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা ছোট্ট নদীটার নাম ছিলো চন্দনা। গ্রামের পূর্বদিকে হিন্দুপাড়া, পশ্চিমে মুসলিমপাড়া, উত্তরে ছোট্ট একটা গীর্জা আর দক্ষিণে আদিবাসীদের বাঁশের ঘর। কিন্তু চারপাশে এতো ভাগ-ভাগ থাকলেও শিশুদের কাছে এগুলো কখনো ভাগ ছিলো না।

রহিম মিয়ার বয়স তখন দশ। প্রত্যেক সকালে সে তার বাবার গোয়াল থেকে এক গ্লাস দুধ নিয়ে যেতো গোপাল দাসের বাড়ি। গোপাল দাসের মা বিধবা, ছেলে নেই। রহিমের বাবা বলতো, "দুধটা দিয়ে আয় বাবা, গোপাল কাকার মা একটু দুর্বল হয়ে গেছে।" রহিম দৌড়ে যেতো। গোপাল দাস তাকে দেখলেই হেসে বলতো, "আয় রহিম, বস্। আজ তোর জন্যে আমি দই পাতিয়েছি।" দু'জনে একসাথে বারান্দায় বসে দই-দুধ খেতো। তারপর একসাথে হেঁটে যেতো মক্তব আর পাঠশালার দিকে। মক্তবের কল থেকে পানি খেয়ে গোপাল যেতো তার স্কুলে, আর রহিম ফিরতো মক্তবে। কেউ কারো ধর্ম নিয়ে কিছু বলতো না।

গোপালের বয়সও দশ। সে জানতো না যে রহিমের বাবা হিন্দু গোয়ালার কাছ থেকে দুধ কিনে আনে। রহিমও জানতো না যে গোপালের বাবা মসজিদের পাশের দোকান থেকে চাল কিনে আনে। তাদের কাছে এসব ছিলো শুধুই খাবার, শুধুই ভালোবাসা।

বর্ষা এলো। চন্দনা নদী ফুলে উঠলো। একদিন বিকেলে গ্রামের শিশুরা সবাই মিলে নদীর ধারে খেলছিলো। হঠাৎ দেখা গেলো গোপালের ছোট বোন লতা পা পিছলে পড়ে গেছে পানিতে। চিৎকার শুরু হলো। রহিম তখন সবচেয়ে কাছে ছিলো। সে দু'হাতে লতাকে জড়িয়ে ধরলো আর কোনোমতে টেনে তুললো কিনারে। লতার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিলো। রহিমের বুক ধড়ফড় করছিলো। সে চিৎকার করে বললো, "আম্মা! গোপাল কাকা!" গোপাল দৌড়ে এলো। তার চোখে পানি। সে রহিমকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। "তুই আমার বোনকে বাঁচালি রহিম। তুই আমার ভাই।"

সেই দিন থেকে গোপালের বাড়ির দরজা রহিমের জন্যে সবসময় খোলা থাকতো। আর রহিমের বাড়ির দরজা গোপালের জন্যে।

দেখতে দেখতে বিশ বছর পার হয়ে গেলো। রহিম এখন গ্রামের স্কুলের মাস্টার। গোপাল কলকাতায় চাকরি করে। কিন্তু প্রতি বছর দূর্গাপুজোর সময় গোপাল বাড়ি আসে। আসে রহিমের বাড়িতে। রহিমের মা তাকে দেখলেই বলেন, "আয় বাবা, তোর জন্যে পায়েস রেখেছি।" গোপাল হাসে। বলে, "আম্মা, তোমার পায়েস না খেলে আমার পূজো জমে না।"

কিন্তু দেশে এসে গেলো এক অদ্ভুত হাওয়া। শহর থেকে কিছু লোক এলো। তারা মাইক নিয়ে চিৎকার করতে লাগলো। "হিন্দু-মুসলিম আলাদা! এটা আমাদের দেশ! ওটা ওদের দেশ!" গ্রামের যুবকদের মধ্যে একটা অস্থিরতা শুরু হলো। কেউ কেউ বলতে লাগলো, "মসজিদের পাশে মন্দির থাকবে কেন?" কেউ বললো, "মন্দিরের পাশে মসজিদ কেন?"

রহিম শুনছিলো। তার বুকের ভিতরটা কেমন যেন হাহাকার করছিলো। সে গোপালকে চিঠি লিখলো। "ভাই, তুই একবার আয়। গ্রামটা বদলে যাচ্ছে।"

গোপাল ছুটি নিয়ে এলো। সে এসেই রহিমের সাথে বসলো বটগাছের নীচে। সেই বটগাছ, যার নীচে তারা শৈশবে একসাথে বিশ্রাম নিতো। গোপাল বললো, "রহিম, আমি শুনেছি। কিন্তু আমরা কী করবো?"

রহিম বললো, "যা আমরা ছোটোবেলায় করতাম। একসাথে থাকবো। একসাথে লড়বো। কিন্তু এবার লড়বো ঘৃণার বিরুদ্ধে।"

দু'জনে ঠিক করলো, তারা একটা স্কুল খুলবে। নাম হবে 'সবুজগ্রাম মিলন স্কুল'। সেখানে হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান-আদিবাসী সব শিশু একসাথে পড়বে। কোনো ধর্মের নামে কোনো ভাগ থাকবে না।

কিন্তু কাজটা সহজ ছিলো না। যারা বিভেদ ছড়াচ্ছিলো, তারা রাতের অন্ধকারে স্কুলের ইটের গাঁথুনি ভেঙে দিতো। দেওয়ালে লিখে দিতো, "এটা হিন্দুর স্কুল হবে, না হলে কিছুই হবে না।" পরদিন আবার লেখা হতো, "এটা মুসলিমদের স্কুল। হিন্দুরা আসতে পারবে না।"

রহিম আর গোপাল রাত জেগে পাহারা দিতো। এক রাতে গোপাল ধরলো এক যুবককে। সে দেওয়ালে লিখছিলো। গোপাল চিনতে পারলো। সে তাদেরই পাড়ার রাজু। রাজু কাঁপছিলো। গোপাল তাকে জড়িয়ে ধরলো। বললো, "রাজু, তুই কেন এসব করছিস? তোর বাবা তো আমার বাবার সাথে জমিতে কাজ করতো।"

রাজু কেঁদে ফেললো। বললো, "দাদা, আমাকে বলা হয়েছে, এটা না করলে আমি হিন্দু থাকবো না।"

গোপাল বললো, "যে তোকে বলেছে, সে কি তোর জন্যে কখনো রক্ত দিতে পারবে? সে কি তোকে বাঁচাতে পারবে?"

রাজু চুপ করে গেলো।

পরদিন গোপাল আর রহিম গ্রামের মাঠে একটা সভা ডাকলো। সেখানে এলো গ্রামের সবাই। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, আদিবাসী। রহিম দাঁড়ালো। বললো,

"আমরা যে দুধ খেয়ে বড়ো হয়েছি, সে দুধ হিন্দুর গোয়ালা দিয়েছে। যে চাল খেয়েছি, সে চাল মুসলিমের জমি থেকে এসেছে। যে পানি খেয়েছি, সে পানি মসজিদের কলে ছিলো, মন্দিরের পুকুরে ছিলো, গীর্জার কূপে ছিলো। আমরা কেউ কখনো জিজ্ঞেস করিনি, এটা কোন ধর্মের? কারণ এগুলো সবার। ঠিক তেমনি এই দেশও সবার। এই গ্রাম সবার।"

গোপাল উঠলো। বললো, "যখন আমার বোন নদীতে পড়েছিলো, রহিম তাকে বাঁচিয়েছিলো। সেদিন সে হিন্দু-মুসলিম ভাবেনি। সে শুধু ভেবেছিলো, একটা প্রাণ বাঁচাতে হবে। আজ যদি কোনো শিশু বিপদে পড়ে, তাকে বাঁচানোই আমাদের সবচেয়ে বড়ো ধর্ম।"

সেই দিন থেকে গ্রাম বদলে গেলো। যারা বিভেদ ছড়াতো, তারাও এলো। তারাও ইট তুলে দিতে লাগলো। স্কুলটা দাঁড়ালো। প্রথম দিন যখন শিশুরা এলো, তাদের হাতে ছিলো রঙিন ফুল। কেউ মসজিদ থেকে এনেছে, কেউ মন্দির থেকে, কেউ গীর্জা থেকে। সবাই মিলে একটা ফুলের মালা গাঁথলো। সেই মালা পরানো হলো স্কুলের গেটে।

আজও সবুজগ্রামে সেই স্কুল আছে। নাম এখনো 'মিলন স্কুল'। প্রতি বছর দূর্গাপুজোর সময় গোপাল আসে। রহিমের বাড়িতে পায়েস খায়। ঈদের সময় রহিম যায় গোপালের বাড়ি। সেমাই খায়। আর পয়লা বৈশাখে আদিবাসীদের সাথে নাচ গানে মেতে ওঠে।

গ্রামের বুড়োরা বলে, "এই গ্রামে যতোদিন রহিম আর গোপাল থাকবে, ততোদিন কেউ এখানে বিভেদ করতে পারবে না।"

আর শিশুরা যখন জিজ্ঞেস করে, "দাদু, ধর্ম কী?"

বুড়োরা হাসে। বলে, "ধর্ম হলো একটা প্রাণ বাঁচানো। ধর্ম হলো একজনকে আশ্রয় দেওয়া। ধর্ম হলো একসাথে হাসা, একসাথে কাঁদা। বাকিটা সব মানুষের তৈরি নিয়ম।"

আর বটগাছটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তার ছায়ায় এখনো শিশুরা খেলা করে। কেউ বলে না, "তুই হিন্দু, তুই মুসলিম।" তারা শুধু বলে, "চল, খেলি।"

কারণ তারা জানে, এই গ্রাম সবার। এই দেশ সবার। যেমন সূর্য সবার, চাঁদ সবার, বাতাস সবার, তেমনি এই মাটিও সবার। ৯০

আলোচিত সংবাদ

খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশকে ৩০০ মিলিয়ন ডলার দেবে বিশ্বব্যাংক

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে 'ইমার্জেন্সি সাপোর্ট ফর ফুড সিকিউরিটি প্রজেক্ট' বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণসহায়তা দেবে বিশ্বব্যাংকের অঙ্গসংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ)। এ লক্ষ্যে সোমবার (৫ অক্টোবর) বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংক গ্রুপের আইডিএর মধ্যে ২১ কোটি ৯২ লাখ স্পেশাল ড্রয়িং রাইটসের (এসডিআর) অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা প্রায় ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ। ইআরডির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়ে বলা হয়, প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই থেকে ২০২৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী এবং বাংলাদেশ ও ভুটানে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর জঁ পেম নিজ নিজ পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রোপণ মৌসুমে বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সাশ্রয়ী মূল্যে সার সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করাই এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

https://www.bd-pratidin.com/economy/2026/10/05/1309174

তুরস্কে রপ্তানি বেড়েছে ১০০ শতাংশের বেশি

তুরস্কের বাজারে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যমতে, জুলাই-সেপ্টেম্বরে তুরস্কে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় হয়েছে ২১ কোটি ৫ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১০ কোটি ৫২ লাখ ১০ হাজার ডলার। ফলে এক বছরের ব্যবধানে দেশটিতে বাংলাদেশের রপ্তানি বেড়েছে ১০০ দশমিক ১১ শতাংশ। এ সময়ে বাংলাদেশের সামগ্রিক পণ্য রপ্তানি বেড়েছে ৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ। জুলাই-সেপ্টেম্বরে মোট রপ্তানি আয় হয়েছে ১ হাজার ৩০৯ কোটি ৪১ লাখ ৩০ হাজার ডলার। অর্থাৎ দেশের সামগ্রিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধির তুলনায় তুরস্কের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল অনেক বেশি।

https://www.kalerkantho.com/online/national/2026/10/05/1748485

যানজট কমাতে বৃত্তাকার সড়কের কাজ দ্রুত করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

ঢাকা মহানগরের যানজট নিরসনে অভ্যন্তরীণ বৃত্তাকার সড়ক নির্মাণকাজের অগ্রগতি পর্যালোচনায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রবিবার (৪ অক্টোবর) বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী। সভায় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগকে সমন্বিতভাবে প্রকল্পের বিদ্যমান পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে নির্মাণকাজের গতি বাড়ানোর নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে দ্রুত তা দূর করা, সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা এবং কাজ শেষ করতে বাস্তবসম্মত সময়সীমা নির্ধারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। একই সঙ্গে প্রকল্পের কাজে দ্রুত দৃশ্যমান অগ্রগতি নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।

https://www.bd-pratidin.com/national/2026/10/04/1308565

টেসলা-মার্সিডিজ গাড়ির চেয়েও মাল্টায় শুল্ক-কর বেশি

বাংলাদেশে বৈদ্যুতিক গাড়ি আমদানিতে শুল্ক-কর তুলনামূলক কম হলেও মাল্টার মতো তাজা ফল আমদানিতে করভার অস্বাভাবিকভাবে বেশি। চলতি অর্থবছরে ৫০ হাজার ডলারের টেসলা গাড়িতে সর্বোচ্চ শুল্ক-করভার ৮০ শতাংশ এবং ২৫ হাজার ডলারের বিওয়াইডি বা একই শ্রেণির বৈদ্যুতিক গাড়িতে ৬৪ শতাংশ। অন্যদিকে ১ হাজার ৯৯৯ সিসির প্লাগ-ইন হাইব্রিড মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়িতে শুল্ক-কর দিতে হয়েছে ৯৬ দশমিক ১০ শতাংশ। অথচ মাল্টা আমদানিতে মোট করভার ১২১ দশমিক ৭৮ শতাংশ। গত দুই দশকে মাল্টার শুল্ক-কর কয়েক ধাপে বেড়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে করভার ছিল ৫৯ দশমিক ২৫ শতাংশ, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮৯ দশমিক ৩২ শতাংশে এবং পরে ১২১ দশমিক ৭৮ শতাংশে উন্নীত হয়। ফলে প্রতি কেজি প্রায় ৮৭ টাকা মূল্যের মাল্টায় আমদানি পর্যায়েই প্রায় ১০৭ টাকা শুল্ক-কর দিতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রে মাল্টার কার্যকর গড় শুল্কহার মাত্র ৫ দশমিক ১৯ শতাংশ এবং ভারতে অন্যান্য করসহ মোট করভার প্রায় ৩৩ শতাংশ। উচ্চ করের কারণে আমদানি কমলেও ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মাল্টা থেকে সরকারের রাজস্ব আদায় হয়েছে ১ হাজার ৪৭৭ কোটি টাকা, যা চার বছর আগের তুলনায় প্রায় ৩১ শতাংশ বেশি।

তথ্যসূত্র: দৈনিক প্রথম আলো।

এশিয়ার বাজারে ছয় বছরের সর্বনিম্নে তেলের দাম নামাল সৌদি আরব

এশিয়ার বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তেল রপ্তানিকারক সৌদি আরব। আগামী নভেম্বর মাসের জন্য এশীয় ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করা তেলের আনুষ্ঠানিক মূল্য গত ছয় বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নির্ধারণ করেছে দেশটির রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি সৌদি আরামকো। সোমবার (৫ অক্টোবর) প্রকাশিত মূল্য নির্ধারণী নথিতে এ তথ্য পাওয়া গেছে। এশিয়ার বাজারে বিক্রির জন্য নভেম্বর মাসের আরব লাইট ক্রুড অয়েলের দাম ওমান ও দুবাইয়ের গড় দামের তুলনায় ব্যারেলপ্রতি ৫ ডলার কম নির্ধারণ করা হয়েছে। গত মাসের তুলনায় এই দাম ৩ ডলার কম। রয়টার্সের হিসাবে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দের জুনের পর এটাই এশিয়ার জন্য সৌদি আরবের সবচেয়ে বড় ডিসকাউন্ট। শুধু আরব লাইট নয়, এশিয়ার বাজারে বিক্রি হওয়া ভারী গ্রেডের তেল আরব মিডিয়াম ও আরব হেভির দামও ব্যারেলপ্রতি ৫ ডলার কমানো হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের ধারণা, এশিয়ার বাজারে ক্রেতা ধরে রাখতেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি আরামকো।

তথ্যসূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক

শিক্ষার্থী আন্দোলনে উত্তাল ফ্রান্স, দেশজুড়ে বিক্ষোভের ডাক

শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির দাবিতে শিক্ষার্থীদের চলমান বিক্ষোভের মধ্যে মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) দেশজুড়ে বড় ধরনের আন্দোলনের প্রস্তুতি ফ্রান্স। আন্দোলনকারীদের ডাকে রাজধানী প্যারিসসহ দেশটির বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ ও কর্মসূচি পালনের প্রস্তুতি চলছে। গত এক সপ্তাহ ধরে চলমান এ বিক্ষোভে শত শত স্কুল অবরুদ্ধ হয়েছে। এ সময় অন্তত ১৯০ শিক্ষার্থী আহত এবং ৫ হাজার ৬০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ফ্রান্সের বিচার মন্ত্রণালয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের ৮৭ শতাংশই অপ্রাপ্তবয়স্ক। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়। সোমবার (৫ অক্টোবর) উত্তরাঞ্চলীয় লঁস শহরে একটি স্কুলের কাছে সংঘর্ষের সময় ১৫ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীর হাতে বোমা বিস্ফোরণ হওয়ায় তিনি গুরুতর আহত হন। শিক্ষার্থীদের দাবির মধ্যে রয়েছে শ্রেণিকক্ষে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী কমানো, জরাজীর্ণ স্কুল ভবন সংস্কার এবং পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ। সেপ্টেম্বরে প্যারিসে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ শুরু হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও এতে যোগ দিলে আন্দোলনটি দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

https://dainikamadershomoy.com/details/01a10f5cadb7



লোভী পাখি

অনেক দিন আগে, একটি হ্রদের তীরের গাছগুলিতে এক ঝাঁক পাখি থাকত। ঝাঁকটি একটি বৃদ্ধা রাণী পাখি দ্বারা পরিচালিত হত। প্রতিদিন সকালে, সে পাখিদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে খাবারের সন্ধানে নানা দিকে পাঠিয়ে দিত। সব পাখি সারাদিন ধরে সমানভাবে কঠোর পরিশ্রম করত। যখনই কোনো পাখি কোথাও খাবার খুঁজে পেত, সে দ্রুত সেই খাবারটা রাণীর বাসায় নিয়ে আসত। যদি কোনো পাখির পক্ষে একা খাবারটা বহন করা খুব বেশি হয়ে যেত, তবে সে পুরো দলকে জানিয়ে দিত। তখন দলের পাখিরা মিলে সেটা বাসায় বয়ে নিয়ে যেত।

প্রতি সন্ধ্যায়, রাণী পাখিটি সব পাখিদের মধ্যে খাবার সমানভাবে ভাগ করে দিত, কারণ খাবারের সন্ধানে তারা সবাই সমানভাবে পরিশ্রম করেছিল। এতে নিশ্চিত হতো যে কোনো পাখিই ক্ষুধার্ত থাকবে না।

একদিন খাবারের সন্ধানে একটি পাখির ছানা একটি গ্রামে এসে পৌঁছাল। সে দেখল, অনেক গরুর গাড়ি মাঠ থেকে কাছের বাজারে খাদ্যশস্যের বস্তা নিয়ে যাচ্ছে। সে লক্ষ্য করল, গাড়িগুলো চলার সময় প্রচুর শস্য রাস্তায় পড়ে যাচ্ছে।

এটা দেখে সে খুব খুশি হলো। তার লোভ হলো এবং সে মনে মনে ভাবল, "প্রতিদিন আমি খাবারের সন্ধানে দূর-দূরান্তে উড়ে বেড়াই। হয়তো ঈশ্বর আমাকে এত খাদ্য দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। এই শস্যদানাগুলো আমারই এবং আমার তা অন্য কারও সাথে ভাগ করা উচিত নয়।"

সে তখনই একটি পরিকল্পনা করল। সে উড়ে বাসায় ফিরে গেল এবং রাণী পাখির সাথে দেখা করে তাকে জানালো, এখান থেকে বেশি দূরে নয়, একটি গ্রামের রাস্তা দেখেছে যা তাজা শস্যে ছড়ানো ছিল। সে রাণীকে সেই গাড়িগুলোর কথা বলল যেগুলো মাঠ থেকে বাজারে শস্য নিয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু রাণীকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, "রাস্তায় প্রচুর গাড়ি চলাচল করে, তাই রাস্তায় নেমে শস্যদানা ঠোকরানো খুবই বিপজ্জনক! শস্যদানা কুড়াতে গেলে গাড়ির চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। তাই আমার পরামর্শ হলো, কোনো পাখি যেন ওই দিকে না যায়।"

রাণী ভাবলেন যে পাখিছানাটি যুক্তিসঙ্গত কথাই বলছে। তিনি সব পাখিকে ডেকে গ্রামের দিকে না যাওয়ার জন্য সতর্ক করে দিলেন।

এটা দেখে ছোট্ট পাখিটা খুব খুশি হলো। গ্রামের রাস্তার সমস্ত শস্যদানা এখন তার। সে নিশ্চিত ছিল যে গাড়িগুলো থেকে তার কোনো বিপদ হবে না। সে সকল গাড়ির দিকে নজর রাখবে এবং সামনে থেকে কোনো গাড়ি আসতে দেখলেই সরে যাবে। তার অল্প বয়স আর চটপটে ভাব তাকে এতে সাহায্য করবে।

প্রতিদিন, পাখির ছানাটি গোপনে গ্রামের দিকে উড়ে যেত এবং একাই তাজা শস্যদানা খেত। এখন তাকে খাবারের খোঁজে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো না এবং সামান্য চেষ্টাতেই তার প্রচুর খাবার জুটে যেত।

শীঘ্রই বাচ্চা পাখিটা খুব মোটা হয়ে গেল, কারণ তাকে বেশি উড়তে হতো না। সে তার ক্ষিপ্রতাও হারিয়ে ফেলল।

একদিন পাখিটি ঠোকর দিতে ব্যস্ত থাকায় সামনে থেকে আসা একটি গাড়ি তার চোখে পড়েনি। শস্যদানা ঠোকরানোর সময় গরুর গাড়িটি তাকে চাকার নিচে পিষে ফেলে। লোভী পাখিটা গ্রামের রাস্তায় শেষ পর্যন্ত গাড়ির নিচে মারা পড়ল।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

স্বর্গের রাণী মারীয়া

উষান যোসেফ দালবত

মা মারীয়া স্বর্গের রাণী,
ওগো মা তুমি ঈশ্বর জননী।
তুমি ছিলে এই ধরণীতে,
ঈশ্বরের কাজে সহায়তা দিতে।

ঈশ্বর তোমায় বেছে নিলে
যিশুকে তুমি গর্ভে ধারণ করলে।
তোমার কোলে জন্ম নিলে,
তাঁকে তুমি ভালোবাসা দিলে।

যিশুকে লালন-পালন করলে তুমি,
জগতের পরিত্রাতা হলেন তিনি।
সত্যি মাগো তোমার হৃদয়খানি,
স্নেহ মমতায় ভরিয়ে দিলে এই ধরণী।

ওগো মা তুমি দয়াময়ী জননী
তুমি মোদের শান্তিদায়িনী।
মোরা তব পাপেতে তলিয়ে যাই,
ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই।

আমরা যেন তোমার চরণতলে,
মোরা থাকি যেন তব পদতলে।
মোরা সকলে স্বর্গের যাত্রী,
তুমি মা হও মোদের পথযাত্রী।

মাগো জীবন চলার পথে,
সর্বদা তুমি সহায় থেকো সাথে।
তুমি মাগো স্বর্গের রাণী,
জনম ধরে তোমায় মানি।

মাগো তোমার আদর্শ,
মোরা পাই যেন সর্বস্ব।
মা, ধরণীর দিকে চেয়ে দেখ না!
তোমার নিকট মোদের এই প্রার্থনা।

না থাকি যেন মা তোমায় ছাড়িয়া,
ওগো স্বর্গের রাণী মা মারীয়া।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!



বিশাল পেরেরা



কামুদপুর গির্জায় মহাদূত সাধু মিখায়েলের পর্ব পালন



অর্পা কুজুর: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে রোজ রবিবার সিলেট ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত কামুদপুর মিশনে মহাদূত সাধু মিখায়েলের পর্ব মহাসমরোহে পালন করা হয়। পর্বীয় পবিত্র খ্রিস্টযাগ শুরু হয় সকাল ১১টায়। এ সময় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন সিলেট ধর্ম প্রদেশের ধর্মপাল বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ এবং তাকে সহযোগিতা করেন কামুদপুর মিশনের পালপুরোহিত ফাদার ফ্রান্সেস্কো রিজ্জো এবং গিয়াসনগর সাধু যোহন মাইনর সেমিনারের পরিচালক ফাদার টয়েস নকরেক। উক্ত পর্বদিনে শ্রদ্ধেয় বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ ৯জন শিশুকে বাপ্তিস্ম প্রদান করেন এবং ২৬ জন শিশু প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করে। পবিত্র খ্রিস্টযাগে ধর্মপল্লীর অন্তর্গত চা বাগানের গ্রাম ও পুঞ্জি থেকে আটশ'র বেশি খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগের পরে শ্রদ্ধেয় বিশপ মহোদয় নবনির্মিত ভিত্তোরিয়া হাউজ ছাত্রী নিবাসের শুভ উদ্বোধন করেন। এই হাউজে ছাত্রী নিবাসে প্রায় ১৫জন ছাত্রীর থাকার সুব্যবস্থা রয়েছে। এই ছাত্রী নিবাসটি আধুনিক এবং শুধুমাত্র কলেজ ছাত্রীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। কামুদপুর মিশন নিকটস্থ প্রায় ৩/৪টি কলেজ রয়েছে যেখানে ছাত্রীগণ ভর্তি হতে পারবেন এবং ভিত্তোরিয়া হাউজ ছাত্রী নিবাসে মনোরম পরিবেশে তাদের পড়াশুনা করতে পারবেন। পর্বদিন উপলক্ষে পুঞ্জি ও চা বাগানের শিশুদের অংশগ্রহণে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশপ, পালপুরোহিতসহ ১০টি গ্রাম ও পুঞ্জি থেকে আগত খ্রিস্টভক্তগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। অতঃপর দুপুরের আহার শেষে সকলে উপস্থিতিতে আনন্দঘন পরিবেশে মহাদূত সাধু মিখায়েলের পর্বে শুভ সমাপ্তি ঘটে।

প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হলো ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুলে বিজ্ঞান মেলা



ডিসিনিউজ: গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা অন্তর্গত ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হলো বিজ্ঞান মেলা। এ বছর বিজ্ঞান মেলার মূলসুর ছিল "জানবো, শিখবো, গড়বো ভবিষ্যৎ"। এতে ঢাকা ক্রেডিটের বোর্ড ডিরেক্টর ডন এ. অধিকারী বিজ্ঞান মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণসহ স্কুলের শিক্ষক মণ্ডলী, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডন এ. অধিকারী বলেন, "আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সকল কিছুতেই বিজ্ঞান রয়েছে। সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে ঘুমানো পর্যন্ত আমাদের বিজ্ঞানের ব্যবহার করতে হয়। তোমরা আজকে ছোট পরিসরে প্রজেক্ট তৈরি করে বিজ্ঞান মেলায় অংশ নিয়েছো কিন্তু ভবিষ্যতে আরো বড় পরিসরে এই মেলা হবে এবং তোমাদের প্রজেক্টও বাড়বে।"

স্কুলের শিক্ষার্থীরা চারটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ৩২ টি প্রজেক্ট বিজ্ঞান মেলায় উপস্থাপন করে। এই বিজ্ঞান মেলায় উপস্থাপিত প্রজেক্টগুলোর মধ্যে প্রাধান্য পায় গ্যাস লিকেজ সিগন্যাল, টেরিরিয়াম জলবিদ্যুৎ, এয়ার ক্লিনার প্লান্ট, টেসলা কয়েল এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সাপ্লাই, অটোমেটিক স্ট্রীট লাইট, ভূমিকম্প সতর্কতা যন্ত্র, ভূমিকম্প প্রতিরোধক নিরাপদ ভবন, সৌর বিদ্যুৎ। এছাড়াও প্রজেক্টের মধ্যে ছিল ভাসমান সবজি বাগান, বাটার ফ্লাই গার্ডেন, পরিবেশ বান্ধব মডেল সিটি, লাইড্রোলিক ব্রীজ টারবাইন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, পানির ফিল্টার।

উদ্বোধনের পরে অতিথিবৃন্দ বিজ্ঞান মেলার বিভিন্ন মডেল পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষার্থীরা তাদের মডেলের ধারণা তুলে ধরেন। একই সাথে অতিথিবৃন্দ ক্ষুদে এই ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের উৎসাহ প্রদান করেন।

সৌজন্যে: আরভিএ সংবাদ

কাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে সাধু ভিনসেন্ট ডি'পলের পর্ব উদযাপন



ফাদার জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু: উত্তম মেষপালক কাথিড্রাল ধর্মপল্লীর সাধু ভিনসেন্ট ডি'পল সোসাইটির আয়োজনে উদযাপিত হয় সাধু ভিনসেন্ট ডি'পলের পর্ব। "তোমাদের পরম পিতা যেমন দয়ালু; তোমরাও তেমনি দয়ালু হও" মূলভাবকে কেন্দ্র করে নয়দিনের নভেনা প্রার্থনা ও পাপস্বীকার সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। পর্ব অনুষ্ঠানে ৭৮ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। উক্ত পর্ব দিবসে পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার ফাবিয়ান মার্ডী। উপদেশে তিনি বলেন, সাধু ভিনসেন্ট ডি'পল হলেন দাতব্য কাজের পৃষ্ঠপোষকতাকারী সাধু, দরিদ্রদের পিতা, অসহায়দের সহায়ক ও তরুণদের অনুপ্রেরণা। খ্রিস্টযাগের পর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে ফাদার বাপ্পী ক্রুশ সাধু ভিনসেন্ট ডি'পলের বিষয়ে আলোচনা করেন।

সৌজন্যে: বরেন্দ্র বার্তা

মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং স্কুল (মট্স)
তিন (৩) বছর মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স (এলটিএমসি)
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি-আবাসিক

আগামী ০৩ জানুয়ারি ২০২৭ খ্রিস্টাব্দ (রোজ রবিবার) হতে মট্স-এ তিন (৩) বছর মেয়াদী (ব্যাচ-৫১) কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হবে। নিম্ন বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে আগামী **২২ অক্টোবর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ** এর মধ্যে ৭ নং অনুচ্ছেদে লিখিত ঠিকানায় দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে ।

১। প্রার্থীদের যোগ্যতা ঃ

(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এস.এস.সি. পাশ **(খ) বয়স সীমা ঃ** ১ জানুয়ারি ২০২৭ তারিখে ১৫ থেকে ২০ বছর

(গ) বৈবাহিক অবস্থা ঃ অবিবাহিত **(ঘ) আর্থিক অবস্থা ঃ** অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের গ্রামীণ মেধাবী যুবক

(ঙ) অগ্রাধিকার ঃ আদিবাসী ও কারিতাসের ভূমিহীন সহযোগী দলের পরিবারের সদস্য/ পোষ্য

২। প্রশিক্ষণ বিষয় ঃ

(ক) অটোমোবাইল ঃ অটোমোবাইল এবং কৃষিকাজে ব্যবহৃত ইঞ্জিন এবং যন্ত্রপাতি সংযোজন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়েল্ডিং ও সীট মেটাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইত্যাদি কাজের প্রশিক্ষণ

(খ) মেকানিক্যাল ঃ লেদ, মিলিং, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং ও অন্যান্য মেশিনে যন্ত্রাংশ তৈরী, মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়েল্ডিং ও সীট মেটাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইত্যাদি কাজের প্রশিক্ষণ

৩। প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ঃ

(ক) ১ম ও ২য় বর্ষ ঃ কারিতাস সুইজারল্যান্ডের সহায়তায় প্রস্তুতকৃত গাইডলাইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ট্রেডে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ।

(খ) ৩য় বর্ষ ঃ মট্স এর উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তব ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও তাত্ত্বিক লেখাপড়ার পুনরালোচনা।

৪। বাছাই পদ্ধতি ঃ

(ক) উপরোক্ত যোগ্যতা সাপেক্ষে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাভিত্তিক বাছাই করা হবে (খ) আসন সংখ্যা ঃ ৩০ জন

৫। প্রশিক্ষণ শর্তাবলী ঃ

(ক) প্রশিক্ষণার্থীকে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাসে থাকতে হবে।
(খ) প্রতিষ্ঠানের নিয়মশৃংঙ্খলা মেনে চলতে হবে।
(গ) নিয়মশৃংঙ্খলা পরিপন্থী অথবা যে কোন কারণে প্রশিক্ষণ ত্যাগ করলে সমস্ত খরচ প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দিতে হবে।
(ঘ) **মট্স এ থাকা-খাওয়া ও প্রশিক্ষণ খরচের ৭০% মট্স ও ৩০% টাকা প্রশিক্ষণার্থী বহন করবে।**
(ঙ) **ভর্তিকালীন ভর্তি ফি বাবদ ৮,০০০/- টাকা এবং জানুয়ারি ২০২৭ খ্রিস্টাব্দের থাকা-খাওয়া ও টিউশন ফি বাবদ ২,৫০০/- টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ১০,৫০০/- (দশ হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা জমা দিতে হবে।**
(চ) **প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে ২,৫০০/-** (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা শিক্ষা ঋণের কিস্তি প্রদান করতে হবে।
(ছ) নির্বাচিত এস.এস.সি পাশ প্রার্থীদের ভর্তির সময় মূল মার্কসশীট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশিক্ষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জমা রাখতে হবে।
(জ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের মট্স এর সনদপত্র দেয়া হবে এবং চাকুরীর ব্যাপারে সহায়তা করা হবে।

৬। দরখাস্ত করার নিয়ম ঃ

(ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত দরখাস্ত দিতে হবে।
(খ) দুই কপি সদ্য তোলা রঙিন পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিতে হবে।
(গ) এস.এস.সি পাশ প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট স্কুল প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত এস.এস.সি মার্কসশীট এবং প্রশংসাপত্রের কপি দিতে হবে।
(ঘ) জন্ম নিবন্ধন (অনলাইন কপি)/ জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি দিতে হবে।
(ঙ) কোন প্রকার নেশাগ্রস্ত বা মাদকসেবী প্রার্থী আবেদন করার যোগ্য হবে না।

৭। দরখাস্ত জমা দেওয়ার এলাকা ভিত্তিক কারিতাস আঞ্চলিক অফিসমুহের ঠিকানা ঃ

এলাকার নাম	কারিতাস আঞ্চলিক অফিসের ঠিকানা	এলাকার নাম	কারিতাস আঞ্চলিক অফিসের ঠিকানা
বৃহত্তর ঢাকা ও কুমিল্লা	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ঢাকা অঞ্চল ১/সি -১/ডি, পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬ মোবা: ০১৭২৩১৪৫৭০৬	বৃহত্তর বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, মাদারীপুর, শরিয়তপুর ও গোপালগঞ্জ	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস বরিশাল অঞ্চল সাগরদী, বরিশাল - ৮২০০ মোবা: ০১৭১৯৯০৯৪৮৬
বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ১৫, ক্যাথলিক পাদ্রী মিশন রোড, ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ-২২০০ মোবা:০১৮৩৩৯৯১৩০৫	বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল মহিষবাথান, পো: বক্স-১৯, রাজশাহী - ৬০০০ মোবা: ০১৭৫৫৪৮০৮২
বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল ১/ই বায়েজিদ বোস্তামী রোড, (মিমি সুপার মার্কেটের পিছনে) পূর্ব নাসিরাবাদ পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম মোবা: ০১৮৪১৮০৪০৮৩	বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুর	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল পশ্চিম শিবরামপুর, পোঃ বক্স নং-০৮ দিনাজপুর - ৫২০০ মোবা: ০১৭৩৫৬১১৪৬১
বৃহত্তর খুলনা , যশোর, কুষ্টিয়া , রাজবাড়ী ও ফরিদপুর	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস খুলনা অঞ্চল রূপসা স্ট্র্যান্ড রোড, খুলনা - ৯১০০ মোবা: ০১৭১৮৪০৪৩৮২	বৃহত্তর সিলেট	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস সিলেট অঞ্চল সুরমাগেট, খাদিমনগর, সিলেট ৩১০৩ মোবা: ০১৮১৮১৩৮১৬৪

বি: দ্রঃ সীমিত সংখ্যক আসনে তিন (৩) বছর মেয়াদী এল.টি.এম.সি কোর্সে মাসিক ৩৫০০ টাকা কোর্স ফি প্রদান সাপেক্ষে অনাবাসিক ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। যোগাযোগঃ

পরিচালক
মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং স্কুল
(মট্স)
১/সি-১/এ, পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬

প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিভাগ (মট্স)
মোবাইল : ০১৩২৯৬৩৯৫৪৭, ০১৩২৯৬৩৯৫২২, ০১৩২৯৬৩৯৫২১
Website: www.mawts.org .E-mail: general@mawts.org,

মট্স কারিগরি প্রশিক্ষণের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

বিজ্ঞ/১৯৮/২৬

সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়
৩২, শাহ্ সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০
ফোন: +৮৮ (০২) ৪৭১১৫৯৯৫
মোবাইল : +৮৮০১৭১১৫২৮২০৯

St. Joseph's School of Industrial Trades
32, Shah Sahib Lane, Narinda, Dhaka-1100
Phone: +88 (02) 47115995
Mobile: +88 01711528209

সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ২০২৭
৩২, শাহ্ সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়ে আগামী ২০২৭ খ্রিস্টবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম অতিসত্ত্বর শুরু হতে যাচ্ছে।

ভর্তি পরীক্ষার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও কাগজপত্র:

১) অষ্টম শ্রেণী পাশ করার পর পরবর্তী শ্রেণীগুলোতে অধ্যয়নরত থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।
২) পূর্বের অধ্যায়নরত বিদ্যালয়ের ছাড়পত্রের ফটোকপি।
৩) জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি/জন্ম-নিবন্ধনের ফটোকপি।
৪) সম্প্রতি তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
৫) খ্রীষ্টান ছাত্রদের ক্ষেত্রে বাপ্তিস্মের সার্টিফিকেট (আবশ্যক), পাল-পুরোহিতের নিকট থেকে চিঠি (আবশ্যক)।

পরীক্ষা পদ্ধতি:
ভর্তি পরীক্ষা লিখিত এবং মৌখিক হবে। প্রথমে মৌখিক এবং পরে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে দুই পর্বে। যথা:

ক) প্রথম পর্বের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ৯:০০ ঘটিকা থেকে।

খ) দ্বিতীয় পর্বের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ০৭ জানুয়ারি, ২০২৭ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ৯:০০ ঘটিকা থেকে।

গ) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ: ১০ জানুয়ারি, ২০২৭ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার দুপুর ১২:০০ ঘটিকায়। ফলাফল ফেসবুক পেইজে দেওয়া হবে। (Facebook Page: St.Joseph School of Industrial Trade)।

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, (মেশিন, ইলেক্ট্রিক, ওয়েল্ডিং এবং কার্পেন্ট্রি) এই চারটি বিষয়ের উপর কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হয়। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তিতে উপরোক্ত যে কোন একটি বিষয়ের উপর তিন বছরের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

বাৎসরিক ভর্তি ফি: প্রথম বছরের ভর্তি ফি: ৬,৪৫০.০০ (ছয় হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকা।
পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য ভর্তি ফি: ২,৫০০.০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা।

মাসিক ফি:
খ্রীষ্টান (ক্যাথলিক) ছাত্রদের হোষ্টেলে থাকা এবং খাওয়া বাবদ মাসিক ফি ৮০০.০০ (আটশত) টাকা। প্রশিক্ষণকালে প্রতি মাসে শিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক স্কুলে বেতন ক) ১ম বর্ষের মাসিক ফি ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা; খ) দ্বিতীয় বর্ষের মাসিক ফি ২০০.০০ (দুইশত) টাকা; গ) তৃতীয় বর্ষের মাসিক ফি ২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা।

বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা: অফিস: +৮৮০১৭১১-৫২৮২০৯; মি. টমাস আলেকজান্ডার: ০১৭১২৮৬৯৫৮২; ব্রাদার অনন্ত আন্তনী হেম্ব্রম, সিএসসি: ০১৬০৮২৩৮৫৯৪; অফিস সময় ৮:০০ মিনিট থেকে ৪:০০ মিনিট।

24-9-26

ব্রাদার শংকর আলবার্ট কস্তা, সিএসসি
অধ্যক্ষ

বিজ্ঞ/১৯৭/২৬

বান্দুরা সেমিনারীর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত লাকী কূপন ড্র-এর ফলাফল:

পুরষ্কারের ধরণ	লটারী নাম্বার	নাম	ঠিকানা
প্রথম পুরষ্কার	১০২১১	রশ্মি রোজারিও	মোলাশীকান্দা
দ্বিতীয় পুরক্ষার	২৭১০১	অর্থি কস্তা	ভাটারা
তৃতীয় পুরষ্কার	৩২৩৮৫		
বিশেষ পুরষ্কার	১১৪৬৬	রুপা গমেজ	ইক্রাশী
” ”	১৩৬৭৭	বুলবুল রোজারিও	
” ”	২৯৬৬০	রিটা গমেজ	নাগরী (দ. পানজোড়া)
” ”	২৪৪০৯	রামনুন লিয়ন	শিমূলিয়া (কেওয়াচালা)
” ”	২৯৯		
” ”	২২৭৮		
” ”	৩৮১২৯		
সাধারণ পুরাষ্কার	৮৮১৪	ল্যারি গমেজ	বক্সনগর
” ”	৩৮২০১	প্রতীক	মঠবাড়ী
” ”	১১৫৩৩	জয় গমেজ	হাসনাবাদ
” ”	১৬৬৮২		সেইন্ট পল মিশন স্কুল
” ”	৪১৯১৩	সম্রাট পেরেরা	রমনা
” ”	২৪৫৬৩	ওয়ালনি দালবত	জয়দেবপুর
” ”	৯৪০৯	জলি গমেজ	মোলাশীকান্দা
” ”	৩৮৪০৩	প্রদীপ গমেজ	মঠবাড়ী
” ”	১৩৭১১	ফ্রান্সিস রেক্স গমেজ	রমনা সেমিনারী
” ”	৪৯৪২১	অতুল রোজারিও	তেজকুনীপাড়া
” ”	৮৯৫০	এলবার্ট গমেজ	বক্সনগর
” ”	২৬৫০৫	আরোরা গমেজ	খিলখেত
” ”	৫৮৫০		সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রাল
” ”	৪৯১৭০		বটমলী হোমস্ গার্লস্ হাইস্কুল
” ”	১৪২২৬	অরিদ্র রোজারিও	শোলপুর
” ”	৪৫৩৭৩	বিভুদান বাড়ৈ	মনিপুরীপাড়া
” ”	৬৩৪৭		সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রাল
” ”	১৬১২২	অভি পিটার দাস	সেইন্ট খ্রিস্টিনা চার্চ
” ”	১৪১৮	আন্তনিয়া মালতী গমেজ	রাজাবাজার
” ”	৩৮০৩১	দীপিকা পিউরিফিকেশন	কুলুন, মঠবাড়ী
” ”	শুধুমাত্র কুপন নম্বর আছে এমন:		
” ”	৫১৪৬	২৭৪৫	২৭৮৭৩
” ”	৪০২০৯	৯৯২১	৩৭৪২৬
” ”	৩৯২১১	৪৮৭৩৪	১৯৮১৭
” ”	৮০১৮	৪৮৬৭৮	৪৬৭৮২
” ”	৪৫২৭৫	১১৮৮৪	১৯৫৯০
” ”	৪৫৪৩৪	২০৮৫৯	২৪৯৭৮
” ”	২০৩৭৭	৪৬৯৪৮	১১১৭৭
” ”	৪৬৭৯৮	৪৮৭১৫	৩০১৬৮

যাদের নাম ও ঠিকানা দেয়া আছে তাদের পুরষ্কার নিজ নিজ ধর্মপল্লী থেকে সংগ্রহ করা যাবে। অন্যেরা অনুগ্রহপূর্বক এই ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করবেন: ০১৭৭১৯৪৫৫২২।

ধন্যবাদান্তে, আয়োজক কমিটির পক্ষে, ফাদার তুষার জেমস্ গমেজ

বিজ্ঞ/১৯৬/২৬

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম জেরী প্রিন্টিং।

জেরী প্রিন্টিং প্রেস

বিশ্বস্ততা ও ঝকঝকে নিখুঁত ছাপার নির্ভরতার প্রতীক

সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন।

জেরী প্রিন্টিং প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

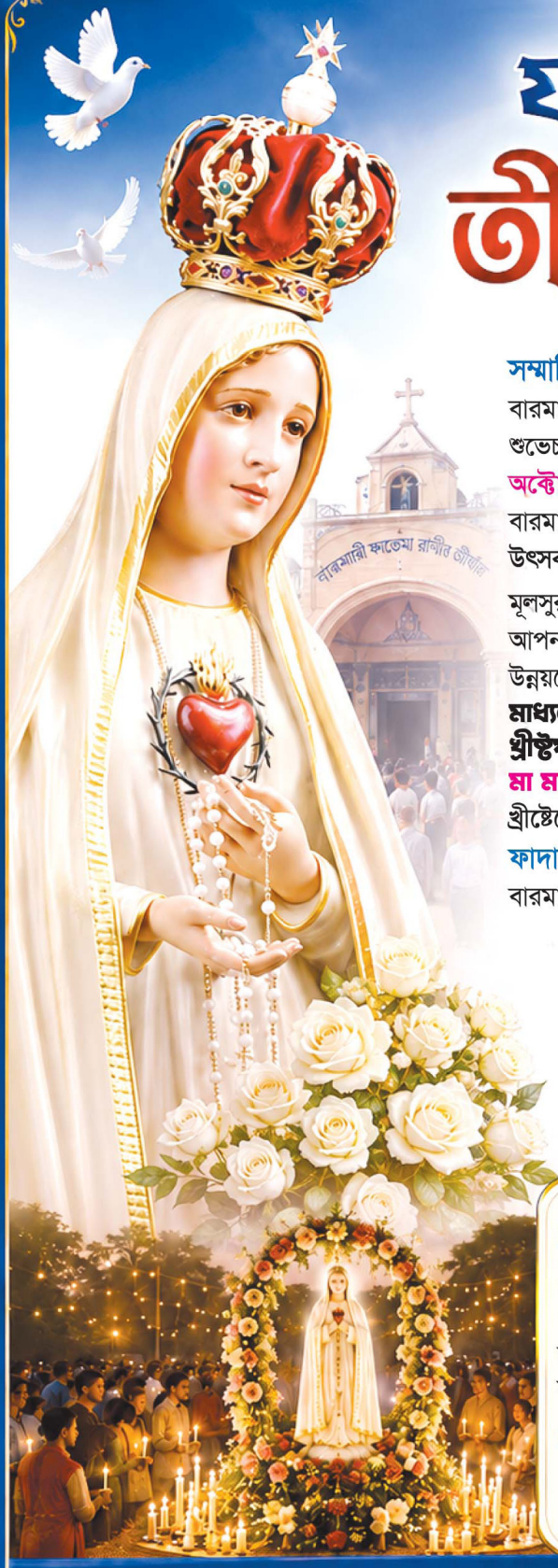
যোগাযোগ :

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ই-মেইল : jerryprintingccc@gmail.com
Phone : 01714712582

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ৩৬
THE WEEKLY PRATIBESHI
Regd. No. DA-33
❖ 11 - 17 October, 2026, ২৬ আশ্বিন - ১ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ফাতেমা রাণীর তীর্থে আমন্ত্রণ



সম্মানিত সুধী,

বারমারী ফাতেমা রাণীর তীর্থস্থান থেকে সবাইকে জানাই খ্রীষ্টিয় প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা। অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আসছে ২৯ থেকে ৩০ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রীষ্টাব্দ, রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার ময়মনসিংহ ধর্মপ্রেদেশের বারমারী ধর্মপল্লীতে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ফাতেমা রাণী মা মারীয়ার তীর্থ উৎসব ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও ভক্তিপূর্ণ পরিবেশে উদ্‌যাপন করা হবে। এ বছরের মূলসুর: "মানবতার জননী: ফাতেমা রাণী মা মারীয়া"।

আপনারা যারা পর্বকর্তা হতে চান, পবিত্র খ্রীষ্টযাগে উদ্দেশ্য ও তীর্থস্থানের উন্নয়নের জন্য অনুদান দিতে আগ্রহী, **আপনারা নিম্নে উল্লেখিত নম্বরগুলোর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবেন। পর্বকর্তা সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা, পবিত্র খ্রীষ্টযাগের উদ্দেশ্য সর্বনিম্ন ২০০ টাকা।**

মা মারীয়ার আশির্বাদ লাভে আপনি/আপনারা সাদরে আমন্ত্রিত।

খ্রীষ্টেতে

ফাদার তরুণ বনোয়ারী (সমন্বয়কারী)
বারমারী ফাতেমা রাণী তীর্থ কার্যকারী কমিটি

ফাদার তরুণ বনোয়ারী
০১৯১৬-৪২৪৪৩৮ বিকাশ

ফাদার নরবার্ট গমেজ
০১৬১৮-৩৪৩৬২৭ বিকাশ

অনুষ্ঠানসূচী

অক্টোবর ২৯, ২০২৬

পুর্নমিলন/পাপস্বীকার	:	দুপুর ০২:০০ ঘটিকা
পবিত্র খ্রিস্টযাগ	:	বিকাল ০৪:০০ ঘটিকা
জপমালার আলোর শোভাযাত্রা	:	রাত ০৮:০০ ঘটিকা
সাক্রামেন্টের আরাধনা ও আলোর শোভাযাত্রা	:	রাত ১১:৩০ ঘটিকা

অক্টোবর ৩০, ২০২৬

জীবন্ত ক্রুশের পথ	:	সকাল ০৮:০০ ঘটিকা
মহাখ্রীষ্টযাগ	:	সকাল ১০:০০ ঘটিকা

আসুন, সবাই মিলে - ফাতেমা রাণীর আশীর্বাদে ধন্য হই।

বিজ্ঞ/১৯৪/২৬

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org